প্রবন্ধ

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

- হিন্দুধর্ম্ম 2
- বেদ 9
- বেদের দেবতা 21
- ইন্দ্র 25
- কোন্ পথে যাইতেছি? 34
- বরুণাদি 37
- সবিতা ও গায়ত্রী 43
- বৈদিক দেবতা 51
- দেবতত্ত্ব 53
- দ্যাবাপৃথিবী 60
- চৈতন্যবাদ 64
- উপাসনা 72
- হিন্দু কি জড়োপাসক? 81
- হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা 83
- বেদের ঈশ্বরবাদ 89
- হিন্দুধর্ম্মের ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই 95

হিন্দুধর্ম্ম

সম্প্রতি সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা দেখা যাইতেছে। অনেকেই মনে করেন যে, আমরা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমান্ হইতেছি। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে আহ্লাদের বিষয় বটে। জাতীয় ধর্ম্মের পুনবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এইরূপ অনুরাগযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমাদের গোটাকত কথা জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম জিজ্ঞাস্য, হিন্দুধর্ম্ম কি? হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে "সত্য সত্য" বলে, হাই উঠিলে তুড়ি দেয়, এ সকল কি হিন্দুধর্ম্ম? অমুক শিয়রে শুইতে নাই, অমুক আস্যে খাইতে নাই, শূন্য কলসী দেখিলে যাত্রা করিতে নাই, অমুক বারে ক্ষৌরী হইতে নাই, অমুক বারে অমুক কাজ করিতে নাই, এ সকল কি হিন্দুধর্ম্ম? অনেকে স্বীকার করিবেন যে, এ সকল হিন্দুধর্ম্ম নহে। মূর্খের আচার মাত্র। যদি ইহা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমরা হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন চাহি না।1

এক্ষণে শুনিতে পাইতেছি যে, হিন্দুধর্ম্মের নিয়মগুলি পালন করিলে শরীর ভাল থাকে। যথা একাদশীর ব্রত স্বাস্থ্যরক্ষার একটি উত্তম উপায়। তবে শরীররক্ষার ব্রতই কি হিন্দুধর্ম্ম? আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত হিন্দু। তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া কি শীত কি বর্ষা প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন এবং তখনই পূজাহ্নিকে বসিয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অনন্যমনে তাহাতে নিযুক্ত থাকেন। পূজাহ্নিকের কিছুমাত্র বিঘ্ন হইলে, মাথায় রবজ্রাঘাত হইল, মনে করেন। তার পর অপরাহ্নে নিরামিষ শাকান্ন ভোজন করিয়া একাহারে থাকেন,-ভোজনান্তে জমিদারী কার্য্যে বসেন। তখন কোন্ প্রজার সর্ব্বনাশ করিবেন, কোন্ অনাথা বিধবার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবেন, কাহার ঋণ ফাঁকি দিবেন, মিথ্যা জাল করিয়া কাহাকে বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন্ মোকদ্দমার কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাতে তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট

থাকে, এবং যত্ন পর্য্যাপ্ত হয়। আমরা জানি যে, এ ব্যক্তির পূজা আহ্নিকে, ক্রিয়া কর্ম্মে, দেবতা ব্রাহ্মণে আন্তরিক ভক্তি, সেখানে কপটতা কিছু নাই। জাল করিতে করিতেও হরিনাম করিয়া থাকেন। মনে করেন, এ সময় হরি-স্মরণ করিলে এ জাল করা আমার অবশ্য সার্থক হইবে। এ ব্যক্তি কি হিন্দু?

আর একটি হিন্দুর কথা বলি। তাঁহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই। যাহা অস্বাস্থ্যকর, তাহা ভিন্ন সকলই খান। এবং ব্রাহ্মণ হইয়া এক আধটু সুরাপান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। যে কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন। যবন ও ম্লেচ্ছের সঙ্গে একত্র ভোজনে কোন আপত্তি করেন না। সন্ধ্যা আহ্নিক ক্রিয়া কর্ম্ম কিছুই করেন না। কিন্তু কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়-অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন। নিষ্কাম হইয়া দান ও পরহিত সাধন করিয়া থাকেন। যথাসাধ্য ইন্দ্রিয় সংযম এবং অন্তরে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন। কাহাকে বঞ্চনা করেন না, কখন পরস্ব কামনা করেন না। ইন্দ্রিয়াদি দেবতা আকাশাদি ঈশ্বরের মূর্ত্তি স্বরূপ এবং শক্তি ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, সে সকলের মানসিক উপাসনা করেন। এবং পুরাণকথিত শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বরে প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করেন। হিন্দুধর্ম্মানুসারে গুরুজনে ভক্তি, পুত্র কলত্রাদির সস্নেহ প্রতিপালন, পশুর প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। তিনি অক্রোধ ও ক্ষমাশীল। এ ব্যক্তি কি হিন্দু? এ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হিন্দু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দু নয়? যদি না হয়-তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দুয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দুধর্ম্ম কি? এক ব্যক্তি ধর্ম্মভ্রষ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট। আচার ধর্ম্ম, না ধর্ম্মই ধর্ম্ম? যদি আচার ধর্ম্ম না হয়, ধর্ম্মই ধর্ম্ম হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই হিন্দু বলিতে হয়। তাহাতে আপত্তি কি?

ইহার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে, এ ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্রবিহিত আচারবান্ নহে, এজন্য এ হিন্দু নহে। কোথায় এ হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ পাইব?

এ সকল লোকের বিশ্বাস যে, হিন্দুশাস্ত্রেই হিন্দুধর্ম্ম আছে। এই হিন্দুশাস্ত্র কি? শাস্ত্র তো অনেক। যে সকল গ্রন্থকে শাস্ত্র বলা যায়, তাহার যেখানে যাহা আছে সকলই কি

হিন্দুধর্ম্ম? যদি কোন গ্রন্থ হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া এ দেশে মান্য হয়, তবে সে 'মনুসংহিতা'। মনুতে আছে যে, যুদ্ধকালে শত্রুসেনা যে তড়াগপুষ্করিণ্যাদির জলে স্নান পানাদি করে, তাহা নষ্ট করিবে।2 যে হিন্দুধর্ম্মে তৃষিতকে এক গণ্ডূষ জলদানের অপেক্ষা আর পুণ্য নাই বলে, সেই হিন্দুধর্ম্মেরই এই গ্রন্থে বলিতেছে যে, সহস্র সহস্র লোককে জলপীপাসাপীড়িত করিয়া প্রাণে মারিবে। এটা কি হিন্দুধর্ম্ম? যদি হয়, তবে এরূপ নৃশংস ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবনে কি ফল? বস্তুতঃ এ হিন্দুধর্ম্ম নহে, যুদ্ধনীতি মাত্র, -কি উপায়ে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ক উপদেশ। ইহা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে এ হিন্দুধর্ম্মে মন্বাদি অপেক্ষা মোল্‌ত্‌কে ও নেপোলিয়ন্‌ অধিক অভিজ্ঞ।

স্থূল কথা এই, মনুতে যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ধর্ম্ম নহে, ইহা এক উদাহরণেই সিদ্ধ হইতেছে। এ সকলকে যদি ধর্ম্ম বলা যায়, তবে সে ধর্ম্ম শব্দের অপব্যবহার। যখন বলি, চোরের ধর্ম্ম লুকোচুরি, তখন যেমন ধর্ম্ম শব্দ অর্থান্তরে প্রযুক্ত হয়, এ সকল বিধিকে "রাজধর্ম্ম" ইত্যাদি বলা, সেইরূপ। তবে মনুতে যাহা যাহা পাই, তাহাই যদি ধর্ম্ম নহে, তবে জিজ্ঞাস্য, মনুর কোন্‌ উক্তিগুলিতে হিন্দুধর্ম্ম আছে এবং কোন্‌গুলিতে নাই, এ কথা কে মীমাংসা করিবে? যদি মন্বাদি ঋষিরা অভ্রান্ত হন, তবে তাঁহাদের সকল উক্তিগুলিই ধর্ম্ম-যদি তাহাই ধর্ম্ম হয়, তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম্মানুসারে সমাজ চলা অসাধ্য। মনু হইতেই একটা উদাহরণ দিয়া আমরা দেখাইতেছি। মনে কর, কাহারও পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত। হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে। কাহাকে নিমন্ত্রণ করিবে? মনুতে নিষেধ আছে যে, যে রাজার বেতনভুক্‌, তাহাকে খাওয়াইবে না ; যে বাণিজ্য করে, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে টাকার সুদ খায়, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে বেদধ্যয়নশূন্য, তাহাকে খাওয়াইবে না ; যে পরলোক মানে না, তাহাকে খাওয়াইবে না ; যাহার অনেক যজমান, তাহাকে খাওয়াইবে না, যে চিকিৎসক, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে শ্রৌতস্মার্ত্ত অগ্নি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে খাওয়াইবে না ; যে শূদ্রের নিকট অধ্যয়ন করে, কি শূদ্রকে অধ্যয়ন করায়, যে ছল করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করে, যে দুর্জ্জন, যে পিতামাতার সহিত বিবাদ করে, যে পতিত লোকের সহিত অধ্যয়ন করে, ইত্যাদি বহুবিধ লোককে খাওয়াইবে না। এমন কথাও আছে যে, মিত্র ব্যক্তিকেও ভোজন করাইবে না।

ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে, মনুর এই বিধি অনুসারে চলিলে শ্রাদ্ধকর্ম্মে আজিকার দিনে একটিও ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়। অথচ যে বাপের শ্রাদ্ধ করিল না, তাহাকেই হিন্দু বলি কি প্রকারে? এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণের দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, সর্ব্বাংশে শাস্ত্রসম্মত যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা কোনরূপে এক্ষণে পুনঃসংস্থাপিত হইতে পারে না; কখন হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। আর হইলেও সেরূপ হিন্দুধর্ম্মে এক্ষণে সমাজের উপকার হইবে না, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

যদি সমস্ত শাস্ত্রের সর্ব্বাংশে সংমিলিত যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা পুনঃসংস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকে, তবে এক্ষণে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? দুইটি মাত্র পথ আছে। এক, হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা, আর এক হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে এবং চলিলে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা। হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা আমরা ঘোরতর অনিষ্টকর মনে করি। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি যে, হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আর কোন নূতন ধর্ম্ম সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত, না সমাজকে একেবারে ধর্ম্মহীন রাখা উচিত? যে সমাজ ধর্ম্মশূন্য, তাহার উন্নতি দূরে থাকুক, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।[3] আর তাঁহারা যদি বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মান্তরকে সমাজ আশ্রয় করুক, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, কোন্ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হইবে? পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লামধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্ম, এই তিন ধর্ম্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার আসন গ্রহণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ; কেহই হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। ইস্‌লাম কতকগুলা বন্যজাতি এবং হিন্দুনামধারী কতকগুলা অনার্য্য জাতিকে অধিকৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃতি আর্য্যসমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই। ভারতীয় আর্য্য হিন্দু ছিল, হিন্দুই আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম রাজার ধর্ম্ম হইয়াও কদাচিৎ একখানি চণ্ডালের বা পোদের গ্রাম অধিকার, অথবা দুই একজন কুক্কুট-মাংস-লোলুপ ভদ্রসন্তানকে দখল ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারে নাই।

যখন বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লামধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, তখন আর কোন্ ধর্ম্মকে তাহার স্থানে এখন স্থাপিত করিব? ব্রাহ্মধর্ম্মের আমরা পৃথক্ উল্লেখ করিলাম না, কেন না, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা মাত্র। ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত হইবে।

যখন ধর্ম্মশূন্য সমাজ বিনাশ নিশ্চিত, যদি হিন্দুধর্ম্মের স্থান অধিকার করিবার শক্তি আর কোন ধর্ম্মেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দুসমাজের আর কি গতি আছে? তবে হিন্দুধর্ম্ম লইয়া একটা গণ্ডগোলে পড়িতে হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে, শাস্ত্রোক্ত যে ধর্ম্ম, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করিয়া কখন সমাজ চলিতে পারে না-এখনও চলিতেছে না-এবং বোধ হয়, কখন চলে নাই। তা ছাড়া একটা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম আছে; তৎকর্ত্তৃক শাস্ত্রের কতক বিধি রক্ষিত এবং কতক পরিত্যক্ত এবং অনেক অশাস্ত্রীয় আচার-ব্যবহার-বিধি তাহাতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুধর্মের কি সপক্ষ কি বিপক্ষ সকলেই স্বীকার করেন যে, এই বিমিশ্র এবং কলুষিত হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা হিন্দুসমাজের উন্নতি হইতেছে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, যেটুকু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম, যেটুকু সারভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম্ম, সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত। তাহাই জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করা উচিত। যাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে, যাহা কেবল অপবিত্র কলুষিত দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে ধর্ম বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, যাহা কেবল অলীক উপন্যাস, যাহা কেবল কাব্য, অথবা প্রত্নতত্ত্ব, যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরদিগের স্বার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং অজ্ঞ ও নির্ব্বোধগণ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহা কেবল বিজ্ঞান, অথবা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিজ্ঞান, যাহা কেবল ইতিহাস, অথবা কেবল কল্পিত ইতিহাস, কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে বিন্যস্ত বা প্রক্ষিপ্ত হওয়া ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইয়াছে, সে সকল এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয় তাহাই ধর্ম্ম। এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্ম্মেরই সারভাগ গঠিত, এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্বসকল, সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মেই প্রবল। হিন্দুধর্ম্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ আছে,

এরূপ আর কোন ধর্ম্মেই নাই। সেটুকু সারভাগ। সেইটুকুই হিন্দুধর্ম্ম। সেটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে-শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকচারে থাকুক-তাহা অধর্ম্ম। যাহা ধর্ম্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য, তাহা অধর্ম্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবু অসত্য, অধর্ম্ম বলিয়া পরিহার্য্য।

এ কথায় দুইটি গোল ঘটে। প্রথম, বেদাদিতে অসত্য বা অধর্ম্ম আছে, বা থাকিতে পারে, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। এমন কথা শুনিলে অনেকে কানে আঙ্গুল দিবেন। এ সম্প্রদায়ের জন্য আমরা লিখিতেছি না। তাঁহাদের যা হোক্ একটা ধর্ম্ম অবলম্বন আছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইয়াছেন, অথচ অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের জন্যই লিখিতেছি। তাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিবেন না।

আর একটি গোলযোগ এই যে, হিন্দুশাস্ত্রের কোন্ কথা সত্য, কোন্ কথা মিথ্যা, ইহার মীমাংসা কে করিবে? কোন্টুকু ধর্ম্ম, কোন্টুকু ধর্ম্ম নয়? কোন্টুকু সার, কোন্টুকু অসার? উত্তর, আপনাদেরই তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। সত্যের লক্ষণ আছে। যেখানে সেই লক্ষণ দেখিব, সেইখানেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিব। যাহাতে সে লক্ষণ দেখিব না, তাহা পরিত্যাগ করিব। অতএব প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নিরূপণ পক্ষে, আগে দেখিতে হইবে, হিন্দুশাস্ত্রে কি কি আছে।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র অগাধ সমুদ্র। তাহার যথোচিত অধ্যয়নের অবসর অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু সকলে পরস্পর সাহায্য করিলে, সকলেরই কিছু কিছু উপকার হইতে পারে। আমরা সে বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করি।-'প্রচার,' ১ম বর্ষ, পৃ.

------

1 পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে-হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া, এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া, আমরা তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিলাম না।

2 ভিন্দ্যার্চ্চৈব তড়াগানি প্রাকারোপরিখাস্তথা ইত্যাদি। ৭ম অধ্যায়, ১৯৬।

3 অনেকে বলেন যে, ধর্ম্ম (Religion) পরিত্যাগ করিয়া কেবল নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ চলিতে পারে ও উন্নত হইতে পারে। এ কথার প্রতিবাদের এ স্থান নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, এমন কোন সমাজ দেখা যায় নাই যে, ধর্ম্ম ছাড়িয়া, কেবল নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া উন্নত হইয়াছে। দ্বিতীয়, এই নীতিবাদীরা যাহাকে নীতি বলেন, তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম বা ধর্ম্মমূলক।

বেদ

বেদ, হিন্দুশাস্ত্রের শিরোভাগে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং আর সকল শাস্ত্রের আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্য শাস্ত্রে যাহা বেদাতিরিক্ত আছে, তাহা বেদমূলক বলিয়া চলিয়া যায়। যাহা বেদে নাই বা বেদবিরুদ্ধ, তাহাও বেদের দোহাই দিয়া পাচার হয়। অতএব, আগে বেদের কিছু পরিচয় দিব।

সকলেই জানেন, বেদ চারিটি-ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় যে, বেদ তিনটি-ঋক্, যজুঃ, সাম। অথর্ব্ব সে সকল স্থানে গণিত হয় নাই। অথর্ব্ব বেদ অন্য তিন বেদের পর সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিচারে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

কিম্বদন্তী আছে যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, বেদকে এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, আগে চারি বেদ ছিল না, এক বেদই ছিল। বাস্তবিক দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের অনেক শ্লোকার্দ্ধ যজুর্ব্বেদে ও সামবেদে পাওয়া যায়। অতএব এক সামগ্রী চারি ভাগ হইয়াছে ইহা বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

যখন বলি, ঋক্ একটি বেদ, যজুঃ একটি বেদ, তখন এমন বুঝিতে হইবে না যে, ঋগ্বেদ একখানি বই বা যজুর্ব্বেদ একখানি বই। ফলতঃ এক একখানি বেদ লইয়া এক একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরী সাজান যায়। এক একখানি বেদের ভিতর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে।

একখানি বেদের তিনটি করিয়া অংশ আছে, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ। মন্ত্রগুলির সংগ্রহকে সংহিতা বলে, যথা-ঋগ্বেদসংহিতা, যজুর্ব্বেদসংহিতা। সংহিতা, সকল বেদের এক একখানি, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ অনেক। যজ্ঞের নিমিত্ত বিনিয়োগাদি সহিত মন্ত্রসকলের ব্যাখ্যা সহিত গদ্যগ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মপ্রতিপাদক অংশের নাম উপনিষৎ। আবার আরণ্যক নামে কতকগুলি গ্রন্থ বেদের অংশ। এই উপনিষদ্ই ১০৮ খানি।

বেদ কে প্রণয়ন করিল? এ বিষয়ে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। এক মত এই যে, ইহা কেহই প্রণয়ন করে নাই। বেদ অপৌরুষেয় এবং চিরকালই আছে।

কতকগুলি কথা আপনা হইতে চিরকাল আছে। মনুষ্য হইবার আগে, সৃষ্টি হইবার আগে হইতে, মনুষ্য-ভাষায় সঙ্কলিত কতকগুলি গদ্য পদ্য আপনা হইতে চিরকাল আছে ; অধিকাংশ পাঠকই এ মত গ্রহণ করিবেন না, বোধ হয়।

আর এক মত এই যে, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। ঈশ্বর বসিয়া বসিয়া অগ্নিস্তব ও ইন্দ্রস্তব ও নদীস্তব ও অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতির বিবিধ রচনা করিয়াছেন, ইহাও বোধ হয় পাঠকের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস না করিতে পারেন। বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক মত আছে, সে সকল সবিস্তারে সঙ্কলিত করিবার প্রয়োজন নাই। বেদ যে মনুষ্য-প্রণীত, তাহা বেদের আর কিছু পরিচয় পাইলেই, বোধ হয় পাঠকেরা আপনারাই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন। তাঁহারা আপন আপন বুদ্ধিমত মীমাংসা করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

বেদ যেরূপেই প্রণীত হউক, এক জন উহা সঙ্কলিত ও বিভক্ত করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। সেই বিভাগ মন্ত্রভেদে হইয়াছে এবং মন্ত্রভেদানুসারে তিন বেদই দেখা যায়। ঋগ্বেদের মন্ত্র ছন্দোনিবদ্ধ স্তোত্র ; যথা, ইন্দ্রস্তোত্র, অগ্নিস্তোত্র, বরুণস্তোত্র। যজুর্ব্বেদের মন্ত্র প্রশ্লিষ্টপাঠ গদ্যে বিবৃত, এবং যজ্ঞানুষ্ঠানই তাহার উদ্দেশ্য। সামবেদের মন্ত্র গান। ঋগ্বেদের মন্ত্রও গীত হয় এবং গীত হইলে তাহাকেও সাম বলে। অথর্ব্ববেদের মন্ত্রের উদ্দেশ্য মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি।

হিন্দুমতানুসারে অন্য বেদের অপেক্ষা সামবেদের উৎকর্ষ আছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "বেদানাং সামবেদোস্মি দেবানামিত্যাদি"[1] কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের কাছে ঋগ্বেদেরই প্রাধান্য। বাস্তবিক ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য আমরা প্রথমে ঋগ্বেদের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হই। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের পরিচয় পশ্চাৎ দিব, অগ্রে সংহিতার পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে।

ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল ও আটটি অষ্টক। এক একটি মন্ত্রকে এক একটি ঋচ্ বলে। এক ঋষির প্রণীত এক দেবতার স্তুতি সম্বন্ধে মন্ত্রগুলিকে একটি সূক্ত বলে। বহুসংখ্যক ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত সূক্তসকল এক জন ঋষি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইলে একটি মণ্ডল হইল। এইরূপ দশটি মণ্ডল ঋগ্বেদসংহিতায় আছে। কিন্তু এরূপ পরিচয় দিয়া আমরা পাঠকের বিশেষ

কিছু উপকার করিতে পারিব না। এগুলি কেবল ভূমিকা স্বরূপ বলিলাম। আমরা পাঠককে ঋগ্বেদসংহিতার ভিতরে লইয়া যাইতে চাই। এবং সেই জন্য দুই একটা সূক্ত বা ঋক্ উদ্ধৃত করিব। সর্ব্বাগ্রে ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকের প্রথম সূক্তের প্রথম ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু ইহার একটি "হেডিং" আছে। আগে "হেডিং"টি উদ্ধৃত করি।

"ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দা। অগ্নির্দ্দেবতা।

গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। ব্রহ্মযজ্ঞান্তে বিনিয়োগঃ অগ্নিষ্টোমে চ।"

আগে এই "হেডিং"টুকু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ "হেডিং" সকল সূক্তেরই আছে। ব্রাহ্মণ পাঠকেরা দেখিবেন, তাঁহারা প্রত্যহ যে সন্ধ্যা করেন, তাহাতে যে সকল বেদমন্ত্র আছে, সে সকলেরও ঐরূপ একটু একটু ভূমিকা আছে। দেখা যাক্, এই "হেডিং" টুকুর তাৎপর্য্য কি? ইহাতে চারিটি কথা আছে, প্রথম, এই সূক্তের ঋষি, বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা। দ্বিতীয়, এই সূক্তের দেবতা অগ্নি। তৃতীয়, এই সূক্তের ছন্দ গায়ত্রী। চতুর্থ, এই সূক্তের বিনিয়োগ ব্রহ্মযজ্ঞান্তে এবং অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে। এইরূপ সকল সূক্তের একটি ঋষি, একটি দেবতা, ছন্দ এবং বিনিয়োগ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার তাৎপর্য্য কি?

প্রথম, ঋষিশব্দটুকু বুঝা যাক্। ঋষি বলিলে এক্ষণে আমরা সচরাচর সাদা দাড়ীওয়ালা গেরুয়াকাপড়-পরা সন্ধ্যাহ্নিক-পরায়ণ ব্রাহ্মণ-বড় জোর সেকালের ব্যাস বাল্মীকির মত তপোবলবিশিষ্ট একটা অলৌকিক কাণ্ড মনে করি। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সেরূপ কোন অর্থে ঋষি শব্দ এ সকল স্থলে প্রযুক্ত হয় নাই।

বেদের অর্থ বুঝাইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে, তাহার নাম "নিরুক্ত"। নিরুক্ত একটি "বেদাঙ্গ"। যাস্ক, স্থৌলষ্টিবী, শাকপূণি প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষিগণ নিরুক্তকর্ত্তা। বেদের কোন শব্দের যথার্থ অর্থ জানিতে হইলে, নিরুক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এখন, নিরুক্তকার ঋষি শব্দের অর্থ কি বলেন? নিরুক্তকার বলেন এই যে, "যস্য বাক্যং স ঋষি" অর্থাৎ যাহার কথা সেই ঋষি।2 অতএব যখন কোন সূক্তের পূর্ব্বে দেখি যে, এই সূক্তের অমুক ঋষি, তখন বুঝিতে হইবে যে, সূক্তটির বক্তা ঐ ঋষি। এই বক্তা অর্থে

প্রণেতা বুঝিতে হইবে কি? যাঁহারা বলেন, বেদ নিত্য অর্থাৎ কাহারও প্রণীত নহে, তাঁহাদের উত্তর এই যে, বেদ মন্ত্রসকল ঋষিদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাঁহারা মন্ত্ররচনা করেন নাই, জ্ঞানবলে দৃষ্ট করিয়াছিলেন। যে ঋষি যে সূক্ত দেখিয়াছিলেন, তিনিই সেই সূক্তের ঋষি। শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে ইহা জানি, কিন্তু যোগ-বলেই হউক আর যে বলেই হউক, শব্দে যে দৃষ্ট হইতে পারে, ইহা অনেকে কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। যদি কেহ বিশ্বাস করিতে চান যে, যখন লিপিবিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই, তখন মন্ত্রসকল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঋষিদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করুন, আমরা আপত্তি করিব না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বেদেই অনেক স্থলে আছে যে, মন্ত্রসকল ঋষিপ্রণীত, ঋষিদৃষ্ট নহে। আমরা ইহার অনেক উদাহরণ দিতে পারি, কিন্তু অপর সাধারণের পাঠ্য প্রচারে এরূপ উদাহরণের স্থান হইতে পারে না। এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এমন অনেক সূক্ত আছে যে, তাহাতে ঋষিরাই বলিয়াছেন যে, আমরা মন্ত্র করিয়াছি, গড়িয়াছি, সৃষ্ট করিয়াছি বা জন্মাইয়াছি। সে যাহাই হউক, ইহা স্থির যে, ঋষি অর্থে আদৌ তপোবলবিশিষ্ট মহাপুরুষ নহে, সূক্তের বক্তা মাত্র।

এই প্রথম সূক্তের ঋষি মধুচ্ছন্দা। তার পর দেবতা অগ্নি। সূক্তের দেবতা কি? যেমন ঋষি শব্দের আলোচনায় তাহার লৌকিক অর্থ উড়িয়া গেল তেমনি দেবতা শব্দের আলোচনায় ঐরূপ দেবতার লৌকিক অর্থ উড়িয়া যায়। নিরুক্তকার বলেন যে, "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ যা তেনোচ্যতে সা দেবতা" অর্থাৎ সূক্তে যাহার কথা থাকে, সেই সে সূক্তের দেবতা। অর্থাৎ সূক্তের যা "Subject" তাই দেবতা।

ইহাতে অনেকে এমন কথা বলিতে পারেন, এক্ষণে যাহাদিগকে দেবতা বলি, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি, সূক্ত সকলে তাঁহারাই স্তুত হইয়াছেন, অতএব এখন যে অর্থে তাঁহারা দেবতা, সেই অর্থেই তাঁহারা বেদমন্ত্রে দেবতা। এরূপ আপত্তি যে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ দানস্তুতিসকল। কতকগুলি সূক্ত আছে, সেগুলিকে দানস্তুতি বলে। তাহাতে কোন দেবতারই প্রশংসা নাই, কেবল দানেরই প্রশংসা আছে। অতএব ঐ সকল সূক্তের দানই দেবতা। ইহা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি দেবতা শব্দের অর্থ সূক্তের বিষয় (subject), তবে দেবতার আধুনিক অর্থ আসিল কোথা হইতে? এ তত্ত্ব বুঝিবার জন্য

দেবতা শব্দটি একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন, “যো দেবঃ সা দেবতা” যাহাকে দেব বলে, তাহাকেই দেবতা বলা যায়। এই দেব শব্দের উৎপত্তি দেখ। দিব্ ধাতু হইতে দেব। দিব্ দীপনে বা দ্যোতনে। যাহা উজ্জ্বল, তাহাই দেব। আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি উজ্জ্বল, এই জন্য এ সকল আদৌ দেব। এ সকল মহিমাময় বস্তু, এই জন্য আদৌ ইহাদের প্রশংসায় স্তোত্র, অর্থাৎ সূক্ত রচিত হইয়াছিল। কালে যাহার প্রশংসায় সূক্ত রচিত হইতে লাগিল তাহাই দেব হইল। পর্জ্জন্য যিনি বৃষ্টি করেন। তিনি উজ্জ্বল নহেন, তিনিও দেব হইলেন। ইন্দ্ ধাতু বর্ষণে। সংস্কৃতে একটি র প্রত্যয় আছে। রুদ্ ধাতুর পর র করিয়া রুদ্র হয়, অসু ধাতুর পর র করিয়া অসুর হয়। ইন্দ্ ধাতুর পর র করিয়া ইন্দ্র হয়। অতএব যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। যিনি বৃষ্টি করেন তাঁহাকে উজ্জ্বল বলিয়া মনে কল্পনা করিতে পারি না, কিন্তু তিনি ক্ষমতাবান্-বৃষ্টি না হইলে শস্য হয় না, শস্য না হইলে লোকের প্রাণ বাঁচে না। কাজেই তিনিও বৈদিক সূক্তে স্তুত হইলেন। বৈদিক সূক্তে স্তুত হইলেন বলিয়াই তিনি দেবতা হইলেন। এ সকল কথার সবিস্তার প্রমাণ ক্রমে পাওয়া যাইবে।

“ঋষির্মধুচ্ছন্দা। অগ্নির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দাঃ।” ছন্দ বুঝিতে কাহারও দেরী হইবে না। কেন না, ছন্দ ইংরাজি বাঙ্গালাতে আছে। ঋক্গুলি পদ্য, কাজেই ছন্দে বিন্যস্ত। “যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ।” অক্ষর পরিমাণকে ছন্দ বলে। চৌদ্দ অক্ষরে পয়ার হয়-পয়ার একটি ছন্দ। আমাদের যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, নানা রকম ছন্দ আছে, বেদেও তেমনি গায়ত্রী অনুষ্টুভ্, ত্রিষ্টুভ্, বৃহতী, পংক্তি প্রভৃতি নানাবিধ ছন্দ আছে। যে সূক্ত যে ছন্দে রচিত,-আমরা যাহাকে “হেডিং” বলিয়াছি, তাহাতে দেবতা ও ঋষির পর ছন্দের নাম কথিত থাকে। যাঁহারা মাইকেল দত্ত ও হেমচন্দ্রের পূর্ব্বকার কবিদিগের কাব্য পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, এ প্রথা বাঙ্গালা রচনাতেও ছিল। আগে বিষয় অর্থাৎ দেবতা লিখিত হইত, যথা-“গণেশ-বন্দনা।” তাহার পর ছন্দ লিখিত হইত, যথা “ত্রিপদী ছন্দ” বা “পয়ার।” শেষে ঋষি লিখিত হইত, যথা-“কাশীরাম দাস কহে” কি “কহে রায় গুণাকর।” ইংরাজিতেও দেবতা ও ঋষি লিখিতে হয়; ছন্দ লিখিত হয় না। যথা, De Profundis দেবতা Alfred Tennyson ঋষি।

ঋষি দেবতা ও ছন্দের পর বিনিয়োগ। যে কাজের জন্য সূক্তটির প্রয়োজন, অথবা যে কাজে উহা ব্যবহার হইবে, তাহাই বিনিয়োগ। যথা, অগ্নিষ্টোমে বিনিয়োগঃ অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে ইহার নিয়োগ বা ব্যবহার। অতএব ইংরাজিতে বুঝাইতে হইলে বুঝাইব যে, ঋষি (author) দেবতা (subject) ছন্দ (metre) বিনিয়োগ (use) .

এক্ষণে আমরা ঋক্‌টি উদ্ধৃত করিতে পারি।

“অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্ || ”

‘ঈলে’, কি না স্তব করি। “অগ্নিমীলে” কি না অগ্নিকে স্তব করি। এ ঋকের এইটিই আসল কথা। “অগ্নিং” কর্ম্ম “ঈলে” ক্রিয়া। আর যতগুলি কথা আছে, সব অগ্নির বিশেষণ। সেগুলি পরে বুঝাইব। আগে অগ্নি শব্দটি বুঝাই। বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য বলেন, অগ্নি অগ্ ধাতু হইতে হইয়াছে, “অগ কম্পনে।” বাচস্পত্য অভিধানে লেখে, “অগ বক্রগতৌ” কিন্তু ইহার আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে। সে সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে পীড়িত করিব না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি ব্যাখ্যা অনেক কাজ করিয়াছে। নিরুক্তে সেটি পাওয়া যায়। “অগ্র” শব্দ পূর্ব্বক “নী” ধাতুর পর ইন্ প্রত্যয় কর, তাহা হইলে অগ্রণী হইবে। নিরুক্তকার বলেন, ইহাতে “অগ্নি” শব্দ নিষ্পন্ন হইবে। যাহা অগ্রে নীয়মান। এখন যজ্ঞ করিতে গেলে হোম চাই। হোমে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। নহিলে দেবতারা পান না। এই জন্য যাহা প্রথমে যজ্ঞে নীয়মান তাহাই অগ্নি। এই ব্যাখ্যাটি পরিশুদ্ধ বলিয়া কোন মতে গৃহীত হইতে পারে না। কেন না, অগ্নি এই নাম অন্যান্য আর্য্যজাতির মধ্যে দেখা যায়। যথা Latin ignis Slav Ogni তবে নিরুক্তকারের জন্যই হউক আর যে জন্যই হউক, ব্যাখ্যাটা চলিয়াছিল, চলিয়া দেবগঠনে লাগিয়াছিল, তাই ইহার কথা বলিলাম।-কাজেই যদি অগ্রপূর্ব্বক নী ধাতু হইতে অগ্নি হইল, তবে অগ্নি দেবতাদিগের অগ্রণী হইলেন, যদি অগ্রণী হইলেন, তবেই তিনি দেবতাদের প্রধান, আগে যান এ কথাও উঠিল। বহ্বৃক মন্ত্রভাগে আছে- “অগ্নির্মুখং দেবতানাম্।” অগ্নি দেবতাদিগের প্রথম ও মুখস্বরূপ। আর “অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ” দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নিই মুখ্য। এইরূপ কথা হইতে হইতেই

কথা উঠিল, "অগ্নির্বৈ দেবানাং সেনানী" অর্থাৎ অগ্নি দেবতাদিগের সেনানী। সেনানী কি না সেনাপতি।

তারপর এক রহস্য আছে।-আমাদিগের বর্ত্তমান হিন্দুশাস্ত্রে অর্থাৎ পৌরাণিক হিন্দুয়ানিতে দেবতাদিগের সেনাপতি কে? পুরাণেতিহাসে কাহাকে দেবসেনানী বলে? কুমার, কার্ত্তিকেয়, স্কন্দ, ইনিই এখন দেবসেনানী। শেষ প্রচলিত মত এই যে, কার্ত্তিকেয়, মহাদেব অর্থাৎ রুদ্রের পুত্র। যখন এই মত প্রচলিত হইয়াছে, তখন অগ্নি রুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে। অগ্নির সঙ্গে রুদ্রের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা ক্রমে পরে দেখাইব, কিন্তু অতি প্রাচীন ইতিহাসে, যখন অগ্নি রুদ্র হন নাই, তখন কার্ত্তিকেয় অগ্নির পুত্র। যাঁহারা এ তত্ত্বের বিশেষ প্রমাণ খুঁজেন, তাঁহারা মহাভারতের বনপর্ব্বের মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ের ১১২ অধ্যায়ে এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে দেখিতে পাইবেন। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"। অগ্নির দেব-সেনানী, শেষ দাঁড়াইল, অগ্নির ছেলে দেব-সেনানী। কুমার রুদ্রজ, অতএব শেষ মহাদেবের পুত্র।

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্ || "

"অগ্নিমীলে"। অগ্নিকে স্তব করি। অগ্নি কি রূপ তাহা বলা হইতেছে। "পুরোহিতং"। অগ্নি পুরোহিত, অগ্নি হোমকার্য্য সম্পন্ন করেন, এই জন্য অগ্নিকে পুরোহিত বলা যাইতেছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় অগ্নিকে পুনঃ পুনঃ পুরোহিত বলা হইয়াছে। বেদব্যাখ্যায় পাঠক মহাশয়েরা যদি একটুখানি ব্যঙ্গ মার্জ্জনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা বলিতাম যে, আধুনিক পুরোহিতদিগের সঙ্গে অগ্নির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে; যজ্ঞীয় দ্রব্য উভয়েই উত্তমরূপে সংহার করেন।

"যজ্ঞস্য দেবং"। অগ্নি যজ্ঞের দেব। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে আমরা বলিয়াছি- দিব্ ধাতু দীপনে বা দ্যোতনে। "যজ্ঞস্য দেবং" যিনি যজ্ঞে দীপ্যমান।

"ঋত্বিজং। ঋত্বিক্ বলে যাজককে। তখনকার এক একটি বৈদিক যজ্ঞে ষোল জন করিয়া ঋত্বিক্ প্রয়োজন হইত। চারি জন হোতা, চারি জন অধ্বর্য্যু, চারি জন উদ্গাতা, আর চারি জন ব্রহ্মা। যাহারা ঋঙমন্ত্র পাঠ করিত, তাহারা হোতা। যজুর্ব্বেদী ঋত্বিকেরা

অধ্বর্য্যু। আর যাঁহারা সামগান করেন, তাঁহারা উদ্গাতা। যাঁহারা কার্য্য-পরিদর্শক, তাঁহারা ব্রহ্মা।

হোতারং। হোতৃগণ ঋঙ্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, অগ্নি হবিরাদি বহন করিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, এই জন্য হোতা। "ঋত্বিজং হোতারং" সায়নাচার্য্য ইহার এই অর্থ করেন যে, অগ্নি ঋত্বিকের মধ্যে হোতা।

রত্নধাতমম্। ধাতমম্ ধারয়িতারম্। যিনি রত্ন দান করেন, তিনি রত্নধাতম। অগ্নি যজ্ঞফলরূপ রত্ন প্রদান করেন, এই নিমিত্ত অগ্নি রত্নাধাতম।

এই একটি ঋক্ সবিস্তারে বুঝাইলাম, এই সূক্তে এমন নয়টি ঋক্ আছে। অবশিষ্ট আটটি এইরূপ সবিস্তারে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল তাহার একটা বাঙ্গালা অনুবাদ দিতেছি।

"অগ্নি পূর্ব্বঋষিদিগের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন এবং নূতনের দ্বারাও। তিনি দেবতাদিগকে এখানে বহন করুন। ২।

যাহা দিন দিন বাড়িতে থাকে, এবং যাহাতে যশ ও শ্রেষ্ঠ ধীরবত্তা আছে, সেই ধন অগ্নির দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩।

হে অগ্নে! যাহা বিঘ্নরহিত এবং তুমি যাহার সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকর্ত্তা, সেই যজ্ঞই দেবগণের নিকট গমন করে। ৪।

যিনি আহ্বান-কর্ত্তা, যজ্ঞকুশল, বিচিত্র যশঃশালিগণের শ্রেষ্ঠ এবং সত্যরূপ, সেই অগ্নিদেব দেবগণের সহিত আগমন করুন। ৫।

হে অগ্নে! তুমি হবিদাতার যে মঙ্গল কর, হে অঙ্গির! তাহা সত্যই তোমা ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে না। ৬।

হে অগ্নে! আমরা প্রতিদিন রাত্রে ও দিবসে ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে সমীপস্থ হই। ৭।

তুমি যজ্ঞসকলের জ্বলন্ত রাজা, সত্যের জ্বলন্ত রক্ষাকর্ত্তা। এবং স্বগৃহে বর্দ্ধমান, (তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে আমরা তোমার সমীপস্থ হই)। ৮।

হে অগ্নি! পিতা যেমন পুত্রের, তুমি তেমনি আমাদের অনায়াসলভ্য হও ; মঙ্গলার্থে তুমি আমাদের সন্নিহিত থাক। ৯। 3

অনেক হিন্দুরই বিশ্বাস আছে যে, বেদের ভিতর মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য অতি দুরূহ কথা আছে; বুঝিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, কণ্ঠস্থ করাই ভাল-তাও দ্বিজাতির পক্ষে। এজন্য আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম সূক্তের অনুবাদ পাঠককে উপহার দিলাম। লোকে বলে, একটা ভাত টিপিলেই হাঁড়ির পরিচয় পাওয়া যায়, প্রয়োজনমতে আরও কোন কোন সূক্ত উদ্ধৃত করিব। সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

ইহার পর দ্বিতীয় সূক্তের এক দেবতা নহেন। প্রথম তিন ঋকের দেবতা, বায়ু, ৪-৬ ঋকের দেবতা ইন্দ্র ও বায়ু; শেষ তিনটি ঋকের দেবতা, মিত্র ও বরুণ, সংস্কৃতে "মিত্রাবরুণৌ।" মিত্র কে তাহা পরে বলিব। বেদের অনুশীলনে, এমন অনেক দেবতা পাওয়া যাইবে যে, আধুনিক হিন্দুয়ানিতে যাহার নাম মাত্র নাই। আবার, আধুনিক হিন্দুর কাছে যে সকল দেবতার বড় আদর, তাহার মধ্যে অনেকের নামমাত্রও বেদে পাওয়া যাইবে না।

তৃতীয় সূক্তের দেবতাও অনেকগুলি। ১-৩ ঋকের দেবতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বেদে তাঁহাদের নাম "অশ্বিনৌ"। ৪-৬ ঋকের দেবতা ইন্দ্র ; ৭-৯ ঋকের দেবতা "বিশ্বদেবাঃ।" আধুনিক হিন্দু ইহাদিগের নামও অনবগত। ১০-১২ ঋকের দেবতা সরস্বতী।

চতুর্থ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের স্তবই অধিক। ৪ হইতে ১১ পর্য্যন্ত সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। তন্মধ্যে ষষ্ঠ সূক্তে মরুতেরাও আছে। মরুতেরা বায়ু হইতে ভিন্ন। সে প্রভেদ পরে বুঝাইব।

দ্বাদশের আবার অগ্নিদেবতা। ইন্দ্রের পর ঋগ্বেদে অগ্নির স্তবই অধিক।

ত্রয়োদশ সূক্ত "আপ্রী" সূক্ত। আপ্রীসূক্তের বিনিয়োগ পশুযজ্ঞে। ঋগ্বেদে মোট দশটি আপ্রীসূক্ত আছে। এই আপ্রীসূক্তের দেবতাও অগ্নি, কিন্তু সূক্তের ১২টি ঋকে অগ্নির দ্বাদশ মূর্ত্তির স্তব করা হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ সূক্তের অনেক দেবতা, যথা-বিশ্বদেবাঃ, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, মিত্র, বৃহস্পতি, পূষা, ভগ, আদিত্য ও মরুদ্‌গণ।

পঞ্চদশে ইন্দ্রাদি অনেক দেবতা। সায়নাচার্য্য বলেন, ঋতুরাই ইহার দেবতা। ষোড়শে একা ইন্দ্র দেবতা। সপ্তদশে ইন্দ্র, বরুণ। অষ্টাদশের এক দেবতা ব্রহ্মণস্পতি। তিনি কে? সে বড় গোলযোগের কথা। আরও ইন্দ্র ও সোম আছেন, তদ্ভিন্ন দক্ষিণা ও সদসস্পতি বা নারাশংস বলিয়া এক দেবতা আছেন। ঊনবিংশ সূক্তের দেবতা অগ্নি, মরুৎ।

এক অধ্যায়ের দেবতার তালিকা দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। বৈদিক দেবতা কাহারা, তাহা পাঠককে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে এতটা দুঃখ দিলাম। এই এক অধ্যায়ে যে সব দেবতার নাম আছে, অবশ্য এমত নহে। কিন্ত পাঠক দেখিলেন যে, এই এক অধ্যায়ের মধ্যে, যে সকল দেবতা এখনকার পূজার ভাগ খাইতে অগ্রসর তাঁহারা কেহ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, কার্ত্তিক, গণেশ, ইঁহারা কেহই নাই। আমরা ঋগ্বেদের অন্যত্র বিষ্ণুকে খুব মতে পাইব; আর শিবকে না পাই, রুদ্রকে পাইব। ব্রহ্মাকে না পাই, প্রজাপতিকে পাইব। লক্ষ্মীকে না পাই, শ্রীকে পাইব। কিন্তু আর ঠাকুর ঠাকুরাণীগুলির বৈদিকত্বের ও মৌলিকত্বের ও ভারী গোলযোগ। বাঙ্গালার চাউল কলার উপর তাঁহাদের আর যে দাবি দাওয়া থাকে থাকুক, বেদ-কর্ত্তা ঋষিদিগের কাছে তাঁহারা সনন্দ পান নাই, ইহা নিশ্চিত। এখন দেবত্র বাজেয়াপ্ত করা যাইবে কি?

বাজেয়াপ্ত করিলে, অনেক বেচারা দেবতা মারা যায়। হিন্দুর মুখে ত শুনি, হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি। কিন্তু দেখি, বেদে আছে, দেবতা মোটে তেত্রিশটি। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের, ৩৪ সূক্তের, ১১ ঋকে অশ্বীদিগকে বলিতেছেন, "তিন একাদশ (১১x৩-৩৩) দেবতা লইয়া আসিয়া মধুপান কর।" ১।৪৫।২ ঋকে অগ্নিকে বলা হইতেছে, "তেত্রিশটিকে লইয়া আইস" ঐরূপ ১। ১৩৯। ১১ ও ৩। ৬।৯ ও ৮। ২৮।১ ও ৮। ৩০। ২ ও ৮।৩৫।৩ ও ৯।৯২।৪ ঋকে ঐরূপ আছে। কেবল ঋগ্বেদে নয়, শতপথব্রাহ্মণে, মহাভারতে, রামায়ণে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও তেত্রিশটিমাত্র দেবতার কথা আছে।

এখন তেত্রিশ হইতে তেত্রিশ কোটি হইল কোথা হইতে? ইহার উত্তর, বিদ্যাসুন্দরের ভাটের কথায় দেওয়াই উচিত-

"এক মে হাজার লাখ মেয় কহা বনায়কে।"

ঋগ্বেদের ৩।৯।৯ ঋকে আছে, "ত্রীণি শতা ত্রীসহস্রাণি অগ্নিনং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চ অসপর্য্যন্।" তিন শত, তিন সহস্র, ত্রিশ, নয় দেবতা। তেত্রিশ কোটি হইতে আর কতক্ষণ লাগে।4

তার পর জিজ্ঞাস্য এই তেত্রিশটি দেবতা কে কে? ঋগ্বেদে সে কথা নাই, থাকিবার কথাও নয়। তবে শতপথব্রাহ্মণে ও মহাভারতে উহাদিগের শ্রেণীবিভাগ ও নাম পাওয়া যায়। শ্রেণীবিভাগ এইরূপ। দ্বাদশ আদিত্য, একাদশটি রুদ্র এবং আটটি বসু। "আদিত্য" "রুদ্র" এবং "বসু" বিশেষ একটি দেবতার নাম নয়, দেবতার শ্রেণী বা জাতিবাচক মাত্র।

এই হইল একত্রিশ। তারপর এ ছাড়া "দ্যাবা পৃথিবী" এই দুটি লইয়া তেত্রিশটি। শতপথব্রাহ্মণে প্রজাপতিকে ধরিয়া ৩৪টি গণা হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে উহাদিগের নাম নির্দ্দেশ আছে। যথা-

আদিত্য। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র, বিষ্ণু।

রুদ্র। অজ, একপদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন, ঈশ্বর।

বসু। ধর, ধ্রুব, সোম, সবিতা, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস।

-'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৭-৪৬, ১০২-৮।

----

1 বেদের মধ্যে আমি সামবেদ ইত্যাদি।

2 বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের মতে সম্পূর্ণমৃষিবাক্যন্তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঋষি-বাক্যকে সূক্ত বলে।

3 মূল এই সঙ্গে দিলাম। প্রথম ঋক্ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে।

অগ্নি: পূর্বেভি: ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবান্ এহ বক্ষতি। ২।

অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে। যশসং ধীরবত্তমং। ৩।

অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বত: পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। ৪।

অগ্নির্হোতা কবিক্রতু: সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তম:। দেবো দেবেভিরাগমৎ। ৫।

যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। ভবেত্তৎ সতমঙ্গির: । ৬।

উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষা বস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভংরত এমসি। ৭।

রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য সুপায়নো দীদিবিং। বর্ধমানং স্বে দমে। ৮।

স ন: পিতেব সূনবেহগ্নে সুপায়নো ভব। সচস্বা ন: স্বস্তয়ে। ৯।

বাঙ্গালা অনুবাদ যাহা দেওয়া হইল, তাহার মধ্যে ১ ও ২ ঋক্ লেখকের ; অন্য ঋকগুলির অনুবাদ কোন বন্ধু হইতে উপহার প্রাপ্ত।

4 তবু ঋষি ঠাকুর তিন ছাড়েন নাই।

যে তিনের একাদশ গুণে তেত্রিশ, সেই তিনকে শত গুণ, সহস্র গুণ, দশ গুণ ও তিন গুণ করিয়াছেন। লোকে কোটি গুণ করিয়াছে। এই “তিন” পাঠক ছাড়িবেন না। তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মের চরম পৌঁছিতে পারিবেন। সে কথা পরে হইবে।

বেদের দেবতা

(বেদশীর্ষক প্রবন্ধের পরভাগ)

আমরা বেদ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য যে কেবল পাঠককে দেখাইব, বেদে কি রকম সামগ্রী আছে, তাহা নহে। আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য এই যে, বেদে কোন্ দেবতাদের উপাসনা আছে? ঋগ্বেদসংহিতা বেদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, তাই, আমরা এখন ঋগ্বেদসংহিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত, কিন্তু সময়ে বেদের অন্যান্যাংশের দেবোপাসনার স্থূল মর্ম্ম যাহা পাওয়া যায়, তাহা বুঝাইব। এখন, আমরা দেখিয়াছি, ঋগ্বেদে আছে যে, দেবতা তেত্রিশটি, কবি, ভক্ত বা ঠাকুরাণীদিদিগের গল্প গল্পে তেত্রিশ কোটি হইয়াছে।

তার পর দেখিয়াছি যে, সেই তেত্রিশটি দেবতা, শতপথব্রাহ্মণে (ইহাও বেদ) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন, যথা (১) আদিত্য, (২) রুদ্র, (৩) বসু। তার পর মহাভারতে এই তিন শ্রেণীর দেবতার যেরূপ নাম দেওয়া আছে, তাহাও দিয়াছি।

ঋগ্বেদের সঙ্গে ইহার কিছু মিলে না। ইহার মধ্যে কোন কোন দেবতার নামও ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে এমন অনেক দেবতার নাম পাওয়া যায়, যাহা এই তালিকার ভিতর নাই। ঋগ্বেদে কতকগুলি আদিত্যের নাম আছে বটে, এবং রুদ্র ও বসু শব্দদ্বয় বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, এবং অষ্ট বসু, এমন কথা নাই। ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত দেবতাদিগের নাম পাওয়া যায়।

(১) মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্ত্তণ্ড, সূর্য্য, সবিতা ও ইন্দ্র। ইহাদিগকে ঋগ্বেদের কোন স্থানে না কোন স্থানে আদিত্য বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্ত্তণ্ড ইঁহাদিগের কোন প্রাধান্য নাই।

(২) আর কয়টির, অর্থাৎ মিত্র, সূর্য্য, বরুণ, সবিতা ও ইন্দ্রের খুব প্রাধান্য। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত দেবতারাও ঋগ্বেদসংহিতায় বড় প্রবল।

অগ্নি, বায়ু, মরুদ্গণ, বিষ্ণু, পর্জ্জন্য, পূষা, ত্বষ্টা অশ্বীদ্বয়, সোম।

(৩) বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি ও যমেরও কিছু গৌরব আছে।

(৪) ত্রিত, আপ্ত্য, অধিব্রধ্ন ও অজ একপদের নাম স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

(৫) এই কয়টি নামে সৃষ্টিকর্ত্তা বা ঈশ্বর বুঝায়-বিশ্বকর্ম্মা, হিরণ্যগর্ভ, স্কম্ভ, প্রজাপতি, পুরুষ, ব্রহ্ম।

(৬) তদ্ভিন্ন কয়েকটি দেবী আছেন। দুইটি দেবী বড় প্রধানা-অদিতি ও ঊষা।

(৭) সরস্বতী, ইলা, ভারতী, মহী, হোত্রা, বরুত্রী, ধীষণা, অরণ্যানী, অগ্নায়ী, বরুণানী, অশ্বিনী, রোদসী, রাকা, সিনিবালী গুঙ্গূ, শ্রদ্ধা ও শ্রী, এই কয় দেবীও আছেন। তদ্ভিন্ন পরিচিতা সকল নদীগণও স্তুত হইয়াছেন।

এক্ষণে, আগে আদিত্যদিগের কথা কিছু বলিব। আদিত্য শব্দে এখন সচরাচর সূর্য্য বুঝায়। দ্বাদশ আদিত্য বলিলে অনেকেই বারটি সূর্য্য বুঝেন। অনেক পণ্ডিত আবার এই ব্যাখ্যা করেন যে, দ্বাদশ আদিত্য অর্থে বারটি মাস বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে আদিত্য সকল দেবতাদিগের সাধারণ নাম, এরূপ প্রয়োগও আছে। যাঁহারা অমরকোষের ছত্র দুই চারি পড়িয়াছেন, তাঁহারাও জানেন যে, “দেব” ইহার প্রতিশব্দ মধ্যে “আদিতেয়” শব্দটি ধরা হইয়াছে। আদিতেয়, আদিত্য, একই। এরূপ গণ্ডগোল কেন? দেখা যাউক আদিত্য শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

দিত ধাতু বন্ধনে, বা খণ্ডনে বা ছেদনে। দিতি, যাহার বন্ধন নাই, সীমা আছে, খণ্ডিত বা ছিন্ন। অদিতি, যাহার বন্ধন নাই, অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, সীমা নাই, যে অনন্ত ; The Infinite.

এই জড় জগৎ সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, মেঘ, সবই সেই অখণ্ড বা অনন্ত হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, যাহা উজ্জ্বল, তাহাই দেব, সূর্য্যাদি রশ্মিময় পদার্থ দেব। তাহারা অনন্ত হইতে উৎপন্ন ; অদিতি অনন্ত, তাই অদিতি দেবমাতা; দেবতারা আদিত্য। কিন্তু সকল দেবতার মাতা যে অদিতি, ঠিক এ কথা বেদে পাওয়া যায় না। এ কথা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। পুরাণেতিহাসেই, বেদে অঙ্কুরিত যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহাই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনকার সাহেবদিগের এবং সাহেব শিষ্যদিগের মত এই যে, পুরাণ ইতিহাস কেবল মূর্খতা, এবং ঔপধার্ম্মিকতা, ভণ্ডামি এবং নষ্টামি। বাস্তবিক বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা পৌরাণিক ধর্ম্ম অঙ্কুরের অপেক্ষা বৃক্ষের ন্যায় শ্রেষ্ঠ। তবে বৃক্ষটিতে এখন অনেক বানরের

বাসা হইয়াছে বটে। ভরসা আছে, সময়ান্তরে সে কথা বুঝাইব। এক্ষণে কথাটা যাহা বলিতেছি, তাহা এইঃ-পৌরাণিকেরা বুঝিয়াছিল যে, এই অনন্ত,-অনন্ত কাল ও অনন্ত স্থিতি, অনন্ত জড়পরম্পরা, অনন্ত জীবপরম্পরা-এই অদিতি; (The Infinite in time, space and existence) ইহাই সর্ব্বপ্রসূতি। সর্ব্বপ্রসূতি বলিয়া যাহা তেজঃপুঞ্জ, যাহা সুন্দর, যাহা দীপ্তিমান, যাহা মহৎ, যাহা বলবান্-আকাশ চন্দ্র সূর্য্য বরুণ মরুৎ পর্জ্জন্য, সকলেরই প্রসূতি। তাই অদিতি দেবমাতা। কিন্তু ঋগ্বেদে অদিতির একটা বিস্তার নাই। ঋগ্বেদে অদিতি অনন্ত বটে, কিন্তু সে অনন্ত আকাশ। আকাশ অনন্ত, আকাশ অদিতি। তাই বেদে অদিতি কেবল সূর্য্যাদি আদিত্যদিগের মাতা। অদিতি যে আকাশ, তাহা বেদের অনেক স্থানেই লেখা আছে ;-যথা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৬৩ সূক্তের ৩ ঋকে "যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পীযূষং দ্যৌরদিতিরদ্রিবর্হাঃ"-ইত্যাদি।

এখানে অদিতির বিশেষণ "দ্যৌঃ" শব্দ। দ্যৌঃ শব্দে আকাশ।1

অদিতি একটি প্রধানা বৈদিকী দেবী ইহা বলিয়াছি ; কিন্তু দেখিতেছি ইনি আকাশ মাত্র। ইহাকে আকাশ-দেবতা বলা যাইতে পারে। বেদের যে সকল দেবতার নাম করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আরও আকাশ-দেবতা পাইব। বাস্তবিক ঋগ্বেদের দেবতারা, হয়,

(১) আকাশ, যথা, অদিতি, দ্যৌস্, বরুণ (ইনি আদৌ জলেশ্বর নহেন), ইন্দ্র, পর্জ্জন্য।

(২) নয়, সূর্য্য দেবতা, যথা, সূর্য্য, মিত্র, সবিতা, পূষা, বিষ্ণু।

(৩) নয়, অগ্নি দেবতা, যথা, অগ্নি, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, রুদ্র।

(৪) নয়, অন্যবিধ আলোক দেবতা, যথা, সোম, ঊষা, অশ্বীদ্বয়।

(৫) নয়, বায়ু দেবতা, যথা বায়ু, মরুদ্‌গণ।

(৬) নয়, সৃষ্টিকর্ত্তা, যথা, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, পুরুষ, বিশ্বকর্ম্মা।

(৭) ত্বষ্টা, যম প্রভৃতি দুই চারিটি মাত্র এই শ্রেণীর বাহিরে।

-'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ১২৪-২৮।

----

1 শতপথব্রাহ্মণে আছে “ইয়ং বৈ পৃথিবী অদিতি:”, এখানে যদিও পৃথিবীকে অদিতি বলা হইয়াছে, সে অনন্তার্থে। অথর্ব্ব বেদে পৃথিবী হইতে অদিতির প্রভেদ করা হইয়াছে। যথা, “ভূমির্মাতা অদিতির্নো জনিত্রং ভ্রাতান্তরীক্ষম্।” এখানে তিন লোক গণা হইল। এখানেও অদিতি স্পষ্টই আকাশ।

ইন্দ্র

এখন আমরা কতক কতক জানিয়াছি, ঋগ্বেদে কোন্ কোন্ দেবতার উপাসনা আছে। আকাশ দেবতা, সূর্য্য দেবতা, এ সকল কথা এখন ছাড়িয়া দিই। যদি প্রয়োজন বিবেচনা করি, তবে সে কথার সবিশেষ আলোচনা পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন, ইন্দ্রাদির কথা বলি।

এই ইন্দ্রাদি কে? ইন্দ্র বলিয়া যে একজন দেবতা আছেন, কি বিষ্ণু বলিয়া দেবতা এক জন আছেন, ইহা আমরা কেমন করিয়া জানিলাম? কোন মনুষ্য কি তাঁহাদের দেখিয়া আসিয়াছে? তাঁহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে অনেক পাকা হিন্দু বলিলেন, যে, "হাঁ অনেকেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিয়াছে। সেকালে ঋষিরা সর্ব্বদাই স্বর্গে যাইতেন এবং ইন্দ্রাদি দেবতার সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিতেন। এবং তাঁহারাও সর্ব্বদা পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যদিগের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতেন। এ সকল কথা পুরাণ ইতিহাসে আছে।" বোধ হয়, আমাদিগকে এ সকল কথার উত্তর দিতে হইবে না। কেন না, আমাদিগের অধিকাংশ পাঠকই এ সকল কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত নহেন। তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা না বলিয়া থাকা যায় না! পুরাণেতিহাসে যে ইন্দ্রাদি দেবতার বর্ণনা আছে, যাঁহাদিগের সহিত রাজর্ষিরা এবং মহর্ষিরা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং যাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া সশরীরে লীলা করিতেন, তাঁহাদিগের চরিত্র বড় চমৎকার। কেহ গুরুতল্পগামী, কেহ চৌর, কেহ বাঙ্গালি বাবুদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া নন্দনকাননে ঊর্ব্বশী মেনকা রম্ভা লইয়া ক্রীড়া করেন, কেহ অভিমানী, কেহ স্বার্থপর, কেহ লোভী,-সকলেই মহাপাপিষ্ঠ, সকলেই দুর্ব্বল, কখন অসুর কর্ত্তৃক তাড়িত, কখন রাক্ষস কর্ত্তৃক দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ, যখন মানব কর্ত্তৃক পরাজিত, কখন দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মানবদিগের অভিশাপে বিপদগ্রস্ত, সর্ব্বদা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শরণাপন্ন। এই কি দেব-চরিত্র? ইহার সঙ্গে এবং নিকৃষ্ট মনুষ্য-চরিত্রের সঙ্গে প্রভেদ কি? এই সকল দেবতার উপাসনায় মহাপাপ এবং চিত্তের অবনতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। যদি এ সকল দেবতার উপাসনা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন নিশ্চিত বাঞ্ছনীয় নহে। বাস্তবিক

হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য এরূপ নহে। ইহার ভিতর একটা গূঢ় তাৎপর্য্য আছে; তাহা পরম রমণীয় এবং মনুষ্যের উন্নতিকর। সেই কথাটি ক্রমে পরিস্ফুট করিব বলিয়া আমরা এই সকল প্রবন্ধগুলি লিখিতেছি। সেই কথা বুঝিবার জন্য আগে বোঝা চাই, এই সকল দেবতা কোথা হইতে পাইলাম।

অনেকে বলিবেন, বেদেই পাইয়াছি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদেই বা তাঁহারা কোথা হইতে আসিলেন? বেদ-প্রণেতারা তাঁহাদিগকে কোথা হইতে জানিলেন? পাকা হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে বলিবেন, কেন বেদ ত অপৌরুষেয়! বেদও চিরকাল আছেন, দেবতারাও চিরকাল আছেন, সুতরাং তাঁহারাও বেদে আছেন। অপর কেহ বলিবেন, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কাজেই বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণের কথা থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এরূপ পাকা হিন্দুর সঙ্গে বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বলিয়াছি যে, বেদ যে ঋষি-প্রণীত অর্থাৎ মনুষ্য-রচিত, এ কথা বেদেই পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। এ কথায় যাঁহারা বুঝিবেন না তাঁহাদিগকে বুঝাইবার আর উপায় নাই।

`বেদ যদি ঋষি-প্রণীত হইল, তবে বিচার্য্য এই যে, ঋষিরা ইন্দ্রাদিকে কোথা হইতে পাইলেন। তাঁহারা ত বলেন না যে, আমরা ইন্দ্রাদিকে দেখিয়াছি। সে কথা পুরাণ ইতিহাসে থাকুক, ঋগ্বেদ নাই। অথচ তাঁহারা ইন্দ্রাদির রূপ ও গুণ সবিস্তারে বর্ণন করিয়াছেন। খবর পৌঁছিল কোথা হইতে? ইন্দ্রাদি কি, এ কথাটা বুঝিলেই সে কথাটা বুঝিলেই সে কথাটা বোঝা যাইবে। এবং আরও অনেক কথা বোঝা যাইবে।

এই ইন্দ্রকেই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ইঁহার ইন্দ্র নাম হইল কোথা হইতে? কে নাম রাখিল? মনুষ্যে না তাঁর বাপ মায়ে? "তাঁর বাপ মায়ে," এমন কথা বলিতেছি তাহার কারণ এই যে, তাঁহার বাপ মা আছেন, এ কথা ঋগ্বেদে আছে। তবে তাঁর বাপ মা কে, সে বিষয়ে ঋগ্বেদে বড় গোলযোগ। ঋগ্বেদে অনেক রকম বাপ মার কথা আছে। ঋগ্বেদে এক স্থানে মাত্র তিনি আদিত্য বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু শেষ পৌরাণিক তত্ত্ব এই দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি অদিতি ও কশ্যপের পুত্র। পুরাণেতিহাসে তাঁহার এই পরিচয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অদিতি ও কশ্যপ-ইন্দ্রের অন্নপ্রাশনের সময় কি তাঁহার ঐ নাম রাখিয়াছিলেন?

আগে বুঝিয়া দেখা যাউক যে, ইন্দ্র অদিতি এবং কশ্যপের সন্তান কেন হইলেন? অদিতি কে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি-তিনি অনন্ত প্রকৃতি। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার উপর দুই একজন বিলাতী পণ্ডিতের কথা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশের অনেক বাবুর মনঃপূত হইবে। এই জন্য নোটে প্রথমতঃ আচার্য্য রোথের মত, দ্বিতীয়তঃ মাক্ষমূলরের মত উদ্ধৃত করিলাম।[1]

এই ত গেল দেবতাদিগের মা। এখন দেবতাদিগের বাপ কশ্যপের কিছু পরিচয় দিই। এখানে সাহেবদিগের সাহায্য পাইব না বটে, কিন্তু বেদের সাহায্য পাইব। কশ্যপ অর্থে কচ্ছপ। এ অর্থ বেদেও লেখে, আজিও অভিধানেও লেখে। এখন, কচ্ছপের আর একটা সংস্কৃত নাম কূর্ম্ম। আবার কূর্ম্ম শব্দ কৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে-কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে সে কচকচিতে আমাদের কাজ নাই-বৈদিক ঋষিরা তাহার দায়ী-অতএব যে করিয়াছে, সেই কৃ। কূর্ম্ম হইতে হইতে কালক্রমে সেই কর্ত্তা আবার কশ্যপ হইল, কেন না-কূর্ম্ম কশ্যপ একার্থবাচক শব্দ। যিনি সকল করিয়াছেন, যিনি বেদে প্রজাপতি বা পুরুষ বলিয়া অভিহিত, তিনি কূর্ম্ম, তিনিই এই কশ্যপ। এখন বেদ হইতে ইহার প্রমাণ দিতেছি।

"স যৎ কূর্ম্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং ধৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মাৎ কূর্ম্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্ম্ম। তস্মদাহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপা ইতি।" শতপথব্রাহ্মণ ৭। ৪। ১। ৫

ইহার অর্থ-

"কূর্ম্ম নামের কথা বলা যাইতেছে।-প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃজন করিলেন। যাহা সৃজন করিলেন, তাহা তিনি করিলেন (অকরোৎ), করিলেন বলিয়া তিনি কূর্ম্ম। কশ্যপও (অর্থাৎ কচ্ছপ) কূর্ম্ম। এই জন্য লোকে বলে, সকল জীব কশ্যপের বংশ।"

অতএব প্রজাপতি বা স্রষ্টাই কশ্যপ। গোড়ায় তাই। তার উপর উপন্যাসকারেরা উপন্যাস বাড়াইয়াছে।

অতএব ইন্দ্রের বাপ মার ঠিকানা হইল। সকল বস্তুর বাপ মা যে, ইন্দ্রেরও বাপ মা সেই প্রকৃতি পুরুষ। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ নহে; ইন্দ্র যখন হইয়াছেন, সাংখ্য তখন হয় নাই। প্রকৃতি অনন্তসত্তা[2] -পুরুষ আদি কারণ। যখন বাপ মার এরূপ পরিচয় পাইলাম,

তখন এরূপ বুঝা যায় যে, ইন্দ্রও বুঝি একটা শরীরী চৈতন্য না হইবেন-প্রকৃতিতে ঐশী শক্তির বিকাশ মাত্র হইবেন। আমরা প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইন্দ্রের নামেই সে কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। নামটা অদিতি ও কশ্যপ তাঁহার অন্নপ্রাশনের সময় রাখেন নাই, আমরাই রাখিয়াছি। আমরা যাঁহাকে ইন্দ্র বলি, তাঁহার গুণ দেখিয়াই ইন্দ্র নাম রাখিয়াছি। ইন্দ্র ধাতু বর্ষণে। তদুত্তর "র" প্রত্যয় করিয়া "ইন্দ্র" শব্দ হয়। অতএব, যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। আকাশ বৃষ্টি করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ।

আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, অদিতিও আকাশ-দেবতা। আকাশকে দুই বার পৃথক্ পৃথক্ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পনা করা কিছুই অসম্ভব নহে।3 বরং আরও আকাশ-দেবতা আছে-থাকাও সম্ভব। যখন আকাশকে অনন্ত বলিয়া ভাবি, তখন আকাশ অদিতি ; যখন আকাশকে বৃষ্টিকারক বলিয়া ভবি, তখন আকাশ ইন্দ্র ; যখন আকাশকে আলোকময় ভাবি, তখন দ্যৌঃ। এমনই আকাশের আর আর মূর্ত্তি আছে। সূর্য্য অগ্নি বায়ু প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক দেবের উৎপত্তি হইয়াছে, ক্রমে দেখাইব।

আমরা যদি এই কথা মনে রাখি যে, বৃষ্টিকারী আকাশই ইন্দ্র, তাহা হইলে ইন্দ্র সম্বন্ধে যত গুণ, যত উপন্যাস, বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে কথিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি। এখন বুঝিতে পারি, ইন্দ্রই কেন বজ্রধর, আর কেহ কেন নহে। যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই বজ্রপাত করেন।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলির সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে, কতকগুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহাতে কিছুই অসম্ভব নাই, কেন না সংহিতা সঙ্কলিত গ্রন্থ মাত্র। নানা সময়ে, নানা ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত, না হয় দৃষ্ট মন্ত্রগুলির সংগ্রহ মাত্র। অতএব তাহার মধ্যে কোনটি পূর্ব্ববর্ত্তী, কোনটি পরবর্ত্তী অবশ্য হইবে। যে সূক্তগুলি আধুনিক, তাহাতে ইন্দ্র শরীরী, চৈতন্যযুক্ত দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন বটে, তখন ইন্দ্রের উৎপত্তি ঋষিরা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সূক্তগুলিতে দেখা যায় যে, ইন্দ্র যে আকাশ, এ কথা ঋষিদের মনে আছে। কতকগুলি উদাহরণ দিতেছি।

"অবর্দ্ধন্নিন্দন্দ্রমরুতশ্চিদত্র মাতা যদ্বীরং দধনদ্ধনিষ্ঠা" ১০। ৭৩। ১

অর্থাৎ যখন তাঁহার ধনাঢ্যা মাতা তাঁহাকে প্রসব করিলেন, তখন মরুতেরা তাঁহাকে বাড়াইলেন। এস্থলে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে।

“ইন্দ্রস্য শীর্ষং ক্রতযো নিরেকে” ১০।১১২।৩

টীকাকারেরা বলেন, ব্রহ্ম শব্দে এখানে বেদ বুঝিবে। এবং অক্ষর পরমাত্মা। তবে কেহ কেহ এই গোলযোগ করেন যে, প্রথম চরণে ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝিয়া, দ্বিতীয় চরণে ব্রহ্ম শব্দে পরব্রহ্ম বুঝেন। নহিলে অর্থ হয় না। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এবং অন্যান্য অনুবাদকারেরা এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং দ্বিতীয় চরণেও ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝিয়াছেন, অতএব এই শ্লোকের এই দুই প্রকার অর্থ করা যায়।

প্রথম শ্রীধরাদির মতে-

“কর্ম্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।”

দ্বিতীয়, শঙ্করাচার্য্যের মতে-

“কর্ম্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব বেদ সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্ব হেতু নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।”

পাঠকের যে ব্যাখ্যা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন; স্থূল তাৎপর্য্যের বিঘ্ন কোনও ব্যাখ্যাতেই হইবে না।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীয় যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ‖ ১৬ ||

এইরূপ প্রবর্ত্তিত চক্রের যে অনুবর্ত্তী না হয়, সে পাপজীবন ও ইন্দ্রিয়ারাম, হে পার্থ, সে অনর্থক জীবন ধারণ করে। ১৬।

(ইন্দ্রিয়সুখে যাহার আরাম, সেই ইন্দ্রিয়ারাম।)

ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব। টীকাকারেরা ইহাকে জগচ্চক্র বলিয়াছেন। কর্ম্ম করিলে এই জগচ্চক্রের অনুবর্ত্তন করা হইল। কেন না, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ হইবে, যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে, মেঘ হইতে অন্ন হইবে। অন্ন হইতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। এই হইল চক্রের এক

ভাগ। এ ভাগ সত্য নহে; কেন না, আমরা জানি, কর্ম্ম করিলে যজ্ঞ4 হয় না, যজ্ঞ করিলেই মেঘ হয় না, মেঘ হইলেই শস্য হয় না (সকল মেঘে বৃষ্টি নাই এবং অতিবৃষ্টিও আছে) ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম্ম আছে, বিনা যজ্ঞেও মেঘ হয়, বিনা মেঘেও শস্য হয় (যথা রবিখন্দ), শস্য বিনাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় (উদাহরণ, সকল অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতি মৃগয়া বা পশুপালন করিয়া খায়) ইত্যাদি।

চক্রের দ্বিতীয় ভাগ এই যে, ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম। ইহাও বিরোধের স্থল। ব্রহ্ম হইতে বেদ না বলিয়া, অনেকে বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অনেকে বলিতে পারেন, বেদ অপৌরুষেরও নহে, ব্রহ্মসম্ভূতও নহে, ঋষিপ্রণীত মাত্র, তাহার প্রমাণ বেদেই আছে। তার পর বেদ হইতে কর্ম্ম, এ কথা কেবল শ্রৌত কর্ম্ম ভিন্ন আর কোন প্রকার কর্ম্ম সম্বন্ধে সত্য নহে। পাঠক দেখিবেন, দশম শ্লোক হইতে আর এই ষোড়শ পর্য্যন্ত আমরা অনৈসর্গিক কথার ঘোরতর আবর্ত্তে পাড়িয়াছি। সমস্তই অবৈজ্ঞানিক (unscientific) কথা। এখানে মহর্ষিতুল্য প্রাচীন ভাষ্যকারেরা কেহই সহায় নহেন; তাঁহারা বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভরিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। আমরা ম্লেচ্ছের শিষ্য; আমাদের উদ্ধারের সে উপায় নাই। তবে ইহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব যে, গীতা বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রচার জন্য Tyndale বা Huxley ইহার প্রণয়ন করেন নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না।

কিন্তু কথাটা বড় সোজা। ইন্দ্র সহস্রাক্ষ। কিন্তু ইন্দ্র আকাশ। আকাশের সহস্র চক্ষু কে না দেখিতে পায়? সাহেবরা কি দেখিতে পান না যে, আকাশে তারা উঠে? সহস্র তারাযুক্ত আকাশ, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র। কথাটা আমি নূতন গড়িতেছি না-অনেক সহস্র বৎসরের কথা। প্রাচীন গ্রীসেও এ কথা প্রচলিত ছিল। তবে আমরা বলি, ইন্দ্র সহস্রাক্ষ ; তাহারা বলে, আর্গস শতাক্ষ।5

পাঠক বলিতে পারেন, তাহা হউক, কিন্তু অহল্যার কথাটা আসিল কোথা হইতে? সকলেই জানেন হল বলে লাঙ্গলকে। অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হলের দ্বারা কর্ষিত হয় না-কঠিন, অনুর্ব্বর। ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া সেই কঠিন ভূমিকে কোমল করেন,-জীর্ণ করেন, এই

জন্য ইন্দ্র অহল্যা-জার। জৃধাতু হইতে জার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন, এই জন্য তিনি অহল্যাতে অভিগমন করেন। কুমারিলভট্ট এ উপন্যাসের আর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা নোটে# উদ্ধৃত করিলাম। উপরি-কথিত ব্যাখ্যাগুলির জন্য লেখক নিজে দায়ী।

এখন বোধ হয় পাঠক কতক কতক বুঝিয়া থাকিবেন যে, হিন্দুধর্ম্মের ইন্দ্রাদি দেবতা কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং পুরাণেতিহাসের উপাখ্যান সকলই বা কোথা হইতে আসিয়াছে। বেদের অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও আমরা কিছু কিছু বলিব।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ইন্দ্রকে পূজা না করিব কেন? ইনি অচেতন, বর্ষণকারী আকাশ মাত্র, কিন্তু ইহাতে কি জগদীশ্বরের শক্তি, মহিমা, দয়ার আশ্চর্য্য পরিচয় পাই না? যদি আমি আকাশ সচেতন, স্বয়ং সুখদুঃখের বিধানকর্ত্তা বলিয়া, তাঁহার উপাসনা করি, যদি তাই ভাবিয়া, তাঁহার কাছে প্রার্থনা করি যে, হে ইন্দ্র! ধন দাও, গোরু দাও, ভার্য্যা দাও, শত্রুসংহার কর, তবে আমার উপাসনা, দুষ্ট, অলীক, উপধর্ম্ম মাত্র। কিন্তু যদি আমার মনে থাকে যে, এই আকাশ নিজে অচেতন বটে, কিন্তু জগদীশ্বরের বর্ষণ-শক্তির বিকাশস্থল ; যে অনন্ত কারুণ্যের গুণে পৃথিবী বৃষ্টি পাইয়া শীতলা, জলশালিনী, শস্যশালিনী, জীবশালিনী হয়, সেই কারুণ্যের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী প্রতিমা, তবে তাহাকে ভক্তি করিলে, পূজা করিলে, ঈশ্বরের পূজা করা হইল। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না ; তবে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি কিসে? তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, তাঁহার শক্তি ও দয়ার পরিচয় পাইয়া। যেখানে সে শক্তি দেখিব, সে পরিচয় পাইব, সেইখানে তাঁহার উপাসনা করিব, নহিলে তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইবে না। আর যদি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি সুখের হয়, তবে জগতে যাহা মহৎ, যাহা সুন্দর, যাহা শক্তিমান্, তাহার উপাসনা করিতে হয়। যদি এ সকলের প্রতি ভক্তিমান্ না হইব, তবে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি লইয়া কি করিব? এ উপাসনা ভিন্ন হৃদয় মরুভূমি হইয়া যাইবে। এগুলি বাদ দিয়া যে ঈশ্বরোপাসনা, সে পত্রহীন বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গহীন উপাসনা। হিন্দুধর্ম্মে এ উপাসনা আছে। ইহা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের বিকৃতি হইয়াছে, ইন্দ্র যে বর্ষণকারী আকাশ, তাহা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে স্বয়ং সুখদুঃখের বিধাতা, অথচ

ইন্দ্রিয়পরবশ, কুকর্ম্মশালী, স্বর্গস্থ একটা জীবে পরিণত করিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের সেইটুকু এখন বাদ দিতে হইবে-হিন্দুধর্ম্মে যে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই, ইহা মনে রাখিতে হইবে। তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর বিশ্বরূপ ; যেখানে তাঁহার রূপ দেখিব, সেইখানে তাঁহার পূজা করিব। সেই অর্থে ইন্দ্রাদির উপাসনা পুণ্যময়-নহিলে অধর্ম্ম। 'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃঃ ১৪৫- ৫৬।

------

1 আচার্য্য রোথ বলেন-

"Aditi Eternity or the Eternal, is the element which sustains and is sustained by the Adityas. This conception, owing to the character of what it embraces, had not in the Vedas been carried out into a definite personification, though the beginnings of such are not wanting. *** This eternal and inviolable principle in which in which the Adityas live and which constitutes their essence is the Celestial Light."

মূর সাহেব কৃতানুবাদ।

২। মোক্ষমূলর বলেন-

"Aditi, an ancient God or Goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning but the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse beyond the earth beyond the clouds beyond the sky."

Translations from the Rig-Veda. I, 230.

সায়নাচার্য্যের মত ভিন্ন প্রকার, কিন্তু তিনি জানেন যে, অদিতি চৈতন্যযুক্তা দেবী-বিশেষ নহেন। তিনি বলেন, "অদিতিং অখণ্ডনীয়াং ভূমিং দিতিং খণ্ডিতাং প্রজাদিকাং।" কেহ কেহ অদিতিকে পৃথিবী মনে করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

2 পাঠকের স্মরণ থাকে যেন প্রথমে অদিতি অনন্তসত্তা বা প্রকৃতি নহেন-প্রথমে অদিতি অনন্ত আকাশ মাত্র। "অনন্ত" ইতিজ্ঞান, প্রথমে আকাশ হইতে জন্মিয়া পরিণামে সমস্ত সত্তায় পৌঁছে।

3 মাও আকাশ, ছেলেও আকাশ, ইহাও বিস্ময়কর নহে। প্রথম যখন আকাশ "অদিতি" এবং আকাশ "ইন্দ্র" বলিয়া কল্পিত হয়, তখন ইহাদিগের মাতা পুত্র সম্বন্ধ কল্পিত হয় নাই। ঋগ্বেদে তিনি অদিতির পুত্রদিগের মধ্যে গণিত হন নাই; কেবল এক স্থানে মাত্র ঋগ্বেদে আদিত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সে সূক্তটিও বোধ হয় আধুনিক।

4 যদি বল, শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মই কর্ম্ম, কাজেই যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম্ম নাই, তাহা হইলে "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" (৫ম শ্লোক), এবং "শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেকর্ম্মণ:" (৮ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যের অর্থ নাই।

5 Even where the tellers of legends may have altered or forgotten its earlier mythic meaning, there are often sufficient grounds for an attempt to restore it. *** For instance the Greeks had still present to their thought the meaning of Argos Panoptes, Io's hundred eyed all seeing guard, who slain by Hermes and changed into a peacock, for Macrobus writes as recognizing in him the star-eyed heaven itself, even as the Aryan Indra-the Sky-is the "thousand eyed."
Tylor's Primitive Culture, p. 230, Vol. I.

"সমস্ততেজা: পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্য: সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়া: ক্ষায়াত্মকজরণহেতুত্বাজ্জীর্জত্যস্মদনেন বোধিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।" ইহার অর্থ। তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্যহেতুক ইন্দ্রপদবাচ্য, অহন অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রের নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতা অহল্যাজার, ব্যভিচার জন্য নহে। বঙ্গদর্শন, ১২৮১-৪৬৮ পৃ:।

কোন্ পথে যাইতেছি?

যাঁহারা ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন, যাহাকে ধর্ম্ম বলিতেছি, তাহা ঈশ্বরোক্ত বা ঈশ্বর-প্রেরিত উপদেশ। তাঁহাদের কাজ বড় সোজা। অমুক গ্রন্থে ঈশ্বরদত্ত উপদেশগুলি পাওয়া যায়, আর তাহার তাৎপর্য্য এই, এই কথা বলিলেই তাহাদের কাজ ফুরাইল। খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্মণ, মুসলমান, য়ীহুদী, সচরাচর এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন যে, কোন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরোক্ত, ইহা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। বৌদ্ধ, কোম্‌ত্, ব্রাহ্ম, এবং নব্য হিন্দু ব্যাখ্যাকারেরা এই মতের উদাহরণস্বরূপ। ইঁহারা কোন গ্রন্থকেই ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। যদি ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম না স্বীকার করিলেন, তবে তাহাদিগকে ধর্ম্মের একটা নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। নইলে ধর্ম্মের কোন মূল থাকে না-কিসের উপর ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইবে? ধর্ম্মের এই নৈসর্গিক ভিত্তি কল্পিত অস্তিত্বশূন্য বস্তু নহে ; যাঁহারা ঈশ্বরপ্রণীত ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি স্বীকার করিতে পারেন।

উপস্থিত লেখক হিন্দুধর্ম্মের অন্যান্য নূতন ব্যাখ্যাকারদিগের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। আমি কোন ধর্ম্মকে ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর প্রেরিত মনে করি না। * ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, ইহাই স্বীকার করি। অথচ স্বীকার করি যে, সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

এই দুইটি কথা একত্রিত করিলে, পাঠক প্রথমে আপত্তি করিবেন যে, এই দুইটি উক্তি পরস্পর অসঙ্গত, হিন্দুধর্ম্মের যাহারা গ্রহণ করে, তাহারা হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বরোক্ত বলিয়াই গ্রহণ করে। কেন না, হিন্দুধর্ম্ম বেদমূলক। বেদ হয় ঈশ্বরোক্ত, নয় ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। যে ইহা মানিল না, সে আবার হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা এবং শ্রেষ্টতা স্বীকার করে কি প্রকারে?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মের যে নৈসর্গিক ভিত্তি আছে হিন্দুধর্ম্ম তাহার উপর স্থাপিত, তাই ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম না মানিয়াও হিন্দুধর্ম্মের যাথার্থ্য ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যাইতে পারে। মহাত্মা রজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই কথা ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে।

যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের উপর এই কথা প্রমাণের ভার আছে। তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্ম, ধর্ম্মের নৈসর্গিক মূলের উপর স্থাপিত। যদি তাহা না দেখাইতে পারেন, তবে এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, “হিন্দুধর্ম্ম তবে ধর্ম্মেই নহে, মিথ্যা ধর্ম্ম।” আর এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, “ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তির কথা ছাড়িয়া দাও-বেদ নিত্য বা বিধিবাক্য বলিয়া স্বীকার কর।”

অতএব হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যায় আমাদের দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্ম, ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। ইহা দেখাইতে গেলে প্রথমে বুঝাইতে হইবে, ধর্ম্মের সেই নৈসর্গিক মূল কি? তাহার পর দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্ম সেই মূলের উপরেই স্থাপিত।

প্রথমটি, অর্থাৎ ধর্ম্মের নৈসর্গিক তত্ত্ব, আমি ‘নবজীবনে’ বুঝাইতেছি। দ্বিতীয়টি ‘প্রচারে বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছি।

আমি ‘নবজীবনে’ দেখাইয়াছি যে, ধর্ম্মের তিন ভাগ, (১) তত্ত্বজ্ঞান, (২) উপাসনা, (৩) নীতি। হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে, ঐ তিন ভাগই একে একে বুঝিয়া লইতে হয়।

হিন্দুধর্ম্মের প্রথম ভাগ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, ইহাকেও আবার তিনটি পৃথক্ অবস্থায় অধীত করিতে হয়। (১) বৈদিক, (২) দার্শনিক, (৩) পৌরাণিক।

এই বৈদিক তত্ত্ব আবার ত্রিবিধ। (১) দেবতাতত্ত্ব, (২) ঈশ্বরতত্ত্ব, (৩) আত্মতত্ত্ব। দেবতাতত্ত্ব প্রধানতঃ সংহিতায় ; আত্মতত্ত্ব উপনিষদে ; ঈশ্বরতত্ত্ব উভয়ে।

অতএব হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যার গোড়ায় ঋগ্বেদসংহিতার দেবতাতত্ত্ব। পাঠক এখন বুঝিয়াছেন যে, কেন আমরা ঋগ্বেদসংহিতার দেবতাদিগকে লইয়া ‘প্রচারে’ ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছি।

পূর্ব্ব কয় সংখ্যায় কয়টি বৈদিক প্রবন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে ভরসা করি, পাঠকদিগের স্মরণ আছে। যথা, (১) বেদে বলে দেবতা মোটে তেত্রিশটি। অনেক আধুনিক দেবতা এই তেত্রিশটির মধ্যে নাই। অনেকে আবার এমন আছেন যে, তাঁহাদের উপাসনা এখন আর প্রচলিত নাই।

(২) সে তেত্রিশটি দেবতা হয় আকাশ, নয় সূর্য্য, নয় অগ্নি, নয় অন্য কোন নৈসর্গিক পদার্থ। তাঁহারা লোকাতীত চৈতন্য, অথবা এখানে যাঁহাকে দেবতা বলি-সেরূপ দেবতা নহেন।

(৩) ঐ নৈসর্গিক পদার্থের যে সকল গুণ তাহার বর্ণনাগুলি ক্রমে বৈদিক এবং পৌরাণিক উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে।

(৪) এ সকল অচেতন পদার্থ জগদীশ্বরের মহিমার পরিচায়ক এবং নিজেও মহান্ বা সুন্দর, অতএব সে সকল বস্তুর ধ্যানে ঈশ্বরে ভক্তি, এবং চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়। এই অর্থে বৈদিক উপাসনা বিধেয়।

এই চারিটির মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তত্ত্বের প্রমাণ এবং উদাহরণস্বরূপ আমি অদিতি ও ইন্দ্রের কিছু বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু আর আর বৈদিক দেবতাগুলির প্রত্যেককে এইরূপ সশরীরে পরিচিত না করিলে, এই দেবতাতত্ত্ব প্রমাণীকৃত বা প্রাঞ্জল হইয়াছে, এমত বিবেচনা করা যায় না। অতএব ইন্দ্রের পরে, বরুণাদির পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু সকলেরই তত সবিস্তারে পরিচয় আবশ্যক হইবে না। আবশ্যক হইলে দিব। দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত হইলে ঈশ্বরতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

পাঠককে এত দূর আনিয়া আমরা কোন্ পথে যাইতেছি, তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল। কোন্ পথে কোথায় যাইতেছি, তাহা না বলিয়া দিলে পাঠক সঙ্গে যাইতে অস্বীকার করিতে পারেন। ‘প্রচার’, ১ম বর্ষ, পৃ. ২০০- ২০৪।

------

* যাহা কিছু জগতে আছে, তাহাই ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত। সে কথা এখন হইতেছে না।

বরুণাদি

আমরা বলিয়াছি, ইন্দ্র ও অদিতি আকাশ-দেবতা। বরুণ আর একটি আকাশ-দেবতা। বৃ ধাতু আবরণে। যাহা চরাচর বিশ্ব আবরণ করিয়া আছে, তাহাই বরুণ। আকাশকে যখন অনন্ত ভাবি, তখন তিনি অদিতি, যখন আকাশকে বৃষ্টিকারী ভাবি, তখন আকাশ ইন্দ্র, যখন আকাশকে সর্ব্বাবরণকারী ভাবি, তখন আকাশ বরুণ।

পুরাণে বরুণ আর আকাশ-দেবতা নহেন, তিনি জলেশ্বর। ঋগ্বেদেও তিনি স্থানে স্থানে জলাধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তাহার কারণ, বেদে পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ অনেক স্থলে জল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।† কিন্তু প্রাচীন কালে তিনি যে আকাশ-দেবতা ছিলেন, গ্রীকদিগের মধ্যে Ouranos দেবতা তাহার এক প্রমাণ। ভাষাতত্ত্ববিৎ পাঠকেরা অবগত আছেন যে গ্রীক ও হিন্দুরা এক বংশসম্ভূত, তাহার অনুল্লঙ্ঘ্য প্রমাণ আছে। গ্রীক ধর্ম্মে Ouranos দেবতা।

ঋগ্বেদে বরুণের বড় প্রধান্য। তিনি সচরাচর সম্রাট্ ও রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিত কেহ কেহ বলেন যে, প্রথমে বরুণ বৈদিক উপাসকদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন, ক্রমে ইন্দ্র তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন। ফলতঃ ঋগ্বেদে বরুণের যেরূপ মাহাত্মা কীর্ত্তিত হইয়াছে, এরূপ ইন্দ্র ভিন্ন আর কোন দেবতারই হয় নাই। পৌরাণিক বরুণ ক্ষুদ্র দেবতা।

আর এক আকাশ-দেবতা "দ্যৌঃ"। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, ইনি গ্রীকদিগের "Zeus" এবং "Zeus Pater" হইয়া রোমকদিগের Jupiter হইয়াছেন। Zeus ও Jupiter উক্ত জাতিদিগের প্রধান দেবতা। "দ্যৌঃ" এককালে আর্য্যদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন। ইঁহাকে বেদে প্রায় পৃথিবীর সঙ্গে একত্রে পাওয়া যায়। যুক্তনাম "দ্যাবা পৃথিবী"। দ্যৌঃ পিতা-পৃথিবীর মাতা। ইঁহাদিগের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা ভবিষ্যতে বলিবার আছে। ইঁহারা যে আকাশ ও পৃথিবী ইঁহাদের নামেই প্রকাশ আছে, অন্য প্রমাণ দিতে হইবে না।

আর একটি আকাশ-দেবতা পর্জ্জন্য। ইনিও ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি করেন, বজ্রপাত করেন, ভূমিকে শস্যশালিনী করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে ইঁহার প্রভেদ কেন হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই, বুঝাইতেও পারিলাম না। তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, পর্জ্জন্য ইন্দ্রের অপেক্ষা প্রাচীন দেবতা। লিথুয়ানিয়া বলিয়া রুষ দেশের একটি ক্ষুদ্র বিভাগ আছে। সে প্রদেশের লোক আর্য্যবংশোদ্ভব। শুনিয়াছি তাহাদের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন বেদের ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য। এমন কি, বেদজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের ভাষা অনেক বুঝিতে পারেন। এই পর্জ্জন্যদেব, সেই প্রদেশে আজিও বিরাজ করিতেছেন। সেখানে নাম Perkunas. সেখানেও তিনি বজ্রবৃষ্টির দেবতা। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে আদিম আর্য্যজাতি, ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় আধুনিক আর্য্যজাতিদিগের পূর্ব্বপুরুষ, পর্জ্জন্য তাঁহাদিগের দেবতা। ইন্দ্রের নাম ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও নাই। ইনি কেবল ভারতবর্ষীয় দেবতা। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিলে তবে ইঁহার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইন্দ্র পর্জ্জন্যের অনেক পরবর্ত্তী।

এক্ষণে সূর্য্যদেবতাদিগের কথা বলি। সূর্য্যদেবতাগুলি সংখ্যায় অনেক। যথা, সূর্য্য, সবিতা, পূষা, মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বিষ্ণু। সূর্য্যের সবিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। সূর্য্যকে প্রত্যহ দেখিতে পাই-তিনি কে তা জানি। অন্য সৌর দেবতাগুলির পরিচয় দিতেছি। যজুর্ব্বেদের মাধ্যনন্দিনী-শাখা চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে ব্রহ্মযজ্ঞপাঠে কতকগুলি দেবতার স্তুতি আছে। তন্মধ্যে রাত্রি, ঊষা ও প্রাতস্তুতির পর পারম্পর্য্যের সহিত কতকগুলির সৌর দেবতার স্তুতি আছে। প্রথমে ভগস্তুতি। তারপর পূষার স্তুতি। তার পর অর্য্যমার স্তুতি। তার পর বিষ্ণুর স্তুতি। পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী যজুর্ব্বেদের মাধ্যনন্দিনী শাখা ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণের অনুবাদের টীকায় ঐ মূর্ত্তি চারিটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "ঊষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল-ইহাকেই অরুণোদয়কাল কহে। প্রাতঃকালের পরেই ভগোদয়কাল-অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরেই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য্য।"

"যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেজা সূর্য্যেকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য।"

তার পর অর্য্যমা, অর্ক একই। সামশ্রমী মহাশয় লিখিতেছেন।-

“পুষোদয়ের পরেই অর্কোদয়কাল-ইহার পরেই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকেই অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অস্তেই পূর্ব্বাহ্ন শেষ হয়।”

“মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।”

ঋগ্বেদে পূষাকে অনেক স্থলেই “পশুপা” “পুষ্টিম্ভর” ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যে ভাবে এই কথাগুলি পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, তাহাতে এমন বোধ হয় যে, যে মূর্ত্তিতে সূর্য্য কৃষিধনের রক্ষাকর্ত্তা, পশুদিগের পাতা, পূষা সূর্য্যের সেই মূর্ত্তি। কিন্তু এই পশু কে, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। অনেক স্থানে পূষা পথিকদিগের দেবতা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে।

যাহাই হউক, পূষা সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, কেন না, তিনি এক্ষণে আর হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত দেবতা নহেন।

এক্ষণে মিত্রের কথা বলি। মিত্র সূর্য্য, কিন্তু মিত্র বরুণের ভাই, বেদে যেখানে মিত্রের স্তুতি, সেইখানে বরুণের স্তুতি,- মিত্রাবরুণৌ বেদের দুইটি প্রধান দেবতা। আদিত্য শব্দ এই দুই দেবতা সম্বন্ধে যেমন পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন আর কোন দেবতা সম্বন্ধেই নহে। আমরা বলিয়াছি যে, বরুণ আকাশ, তবে মিত্র সূর্য্য হইল কোথা হইতে? তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, “ন বৈ ইদং দিবা ন নক্তমাসীদব্যাকৃতং তে দেবা মিত্রাবরুণৌ অব্রুবন্ ইদং নো বিব্যাসয়তামিতি মিত্রো অহরজনয়দ্বরুণো রাত্রিং।” অর্থাৎ দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না-জগৎ অব্যাকৃত ছিল, তখন দেবতারা মিত্র বরুণকে বলিলেন-তোমরা ইহাকে বিভাগ কর। মিত্র দিবা করিলেন, বরুণ রাত্রি করিলেন। ১। ৭। ১০। ১। সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন, “অস্তং গচ্ছন্ সূর্য্য এব বরুণ ইতি উচ্যতে-স হি স্বগমনেন রাত্রিং জনয়তি।” “অস্তগামী সূর্য্যকে বরুণ বলে, তিনি আপনার গমনের দ্বারা রাত্রির সৃষ্টি করেন।” শতপথব্রাহ্মণে আছে, “অয়ং হি লোকো মিত্রঃ। অসৌ বরুণঃ।” অর্থাৎ ইহলোক মিত্র, পরলোক বরুণ। বোধ হয়, ইহাতে পাঠক বুঝিয়াছেন যে, বরুণ সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার-তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, যেখানে কেহ গিয়া আলো করে, সেইখানে আলো হয়, নহিলে অন্ধকার, নহিলে বরুণ। আলো করেন মিত্র, সৌভাগ্যক্রমে এই বরুণ আর এই মিত্র অন্য আর্য্য জাতি মধ্যেও পূজিত। বরুণ যে গ্রীকদিগের Uranos তাহা বলিয়াছি। আবার তিনি

প্রাচীন পারস্যজাতিদিগের দেবতা, এমনও কেহ কেহ বলেন। প্রাচীন পারস্যদিগের প্রধান দেবতা অহুরমজ্‌দ। ভাষাবিদেরা জানেন যে, পারস্যেরা সংস্কৃত স স্থানে হ উচ্চারণ করে।-যথা, সিন্ধু স্থানে হিন্দু সপ্ত স্থানে হপ্ত। তেমনি অসুর স্থানে অহুর। এখন সুরাসুর শব্দ যাঁহারা ব্যবহার করেন তাঁহাদিগের কথার তাৎপর্য্য এই, অসুরেরা দেবতাদিগের বিদ্বেষী,* কিন্তু আদৌ অসুরই দেবতা, অসু নিশ্বাসে। অসু ধাতুর পর র প্রত্যয় করিয়া "অসুর" হয়। অর্থাৎ আকাশে সূর্য্য পর্ব্বতে নদীতে যাঁহাদিগকে প্রাচীন আর্য্যেরা শক্তিশালী লোকাতীত চৈতন্য মনে করিতেন, তাঁহারাই অসুর। বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনঃ পুনঃ "অসুর" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, ঋগ্বেদে বরুণকে পুনঃ পুনঃ "অসুর" বলা হইয়াছে। এই অহুরমজ্‌দ নামের অহুর শব্দের তাৎপর্য্য দেব। অনেক ইউরোপীয় লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই অহুরমজ্‌দ বরুণ। ইনি বরুণ হউন বা না হউন, ইঁহার আনুষঙ্গিক দেবতা মিথ্র যে বরুণের আনুষঙ্গিক মিত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ অল্পই। মিত্র সম্বন্ধে আর একটি রহস্যের কথা আছে। প্রাচীন পারসিকদিগের মধ্যে এই মিথ্রদেবের একটা উৎসব ছিল। সে উৎসব শীতকালে হইত। রোমকেরা যখন আশিয়ার পশ্চিম ভাগ অধিকৃত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা স্বরাজ্য মধ্যে ঐ উৎসবটি প্রচলিত করেন। তার পর রোমক রাজ্য খ্রীষ্টীয়ান হইয়া গেল। কিন্তু উৎসবটি উঠিয়া গেল না। উৎসবটি শেষে খ্রীষ্টের জন্মোৎসব খ্রীষ্টমাসে (Christmas) পরিণত ও সেই নামে পরিচিত হইল। এই যে ইংরেজ মহলে আজি এত গাঁদাফুল ও কেকের শ্রাদ্ধ পড়িয়া গিয়াছে, সাহেবরা জানুন বা না জানুন, মানুন বা না মানুন, এ উৎসব আদৌ আমাদের মিত্রদেবের উৎসব। নোটে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।#

আবার সেই মিত্রদেবের উৎসবই বা কি? সেটা সূর্য্যের উত্তরায়ণের উৎসব। আমাদেরও যে উৎসব আছে-"মকর সংক্রান্ত"-যে দিন সূর্য্যের মকর রাশিতে সঞ্চার হয়। বাস্তবিক এখনকার "মকর সংক্রান্তি", আর যে দিন সূর্য্যের মকর যথার্থ সঞ্চার হয়, সে এক দিনই নয়-মকরে প্রকৃত সঞ্চার, "মকর সংক্রান্তি" হইতে তিন সপ্তাহের কিছু বেশী পিছাইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যতিক্রমের কারণ "Precession of the Equinoxes". জ্যোতিষ শাস্ত্র যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা সহজে গণনা করিতে পারিবেন, কত দিনে এই

ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সে যাহাই হউক, সাহেবদিগের এই আমাদের "মকর সংক্রান্তি" পৌষপার্ব্বণ ও "খ্রীষ্টমাস" একই। কথাটা "আষাঢ়ে" রকম, কিন্তু প্রমাণে কিছু ছিদ্র নাই।- 'প্রচার,' ১ম বর্ষ, পৃ. ২০৪-১০।

এই প্রবন্ধ পড়িবার আগে, ইহার পূর্ব্বস্থিত প্রবন্ধটি পড়িলে ভাল হয়।

† যথা "যে দেবাসো দিবি একাদশ স্থ পৃথিব্যামধি একাদশ স্থ। অপ্সুক্ষিতো মহিনা একাদশ স্থ তে দেবাসো" ইত্যাদি। ১, ১৩৯, ১১।

* অস্যতি ক্ষিপতি দেবান্ উর বিরোধে।

The Roman winter solstice festival as celebrated on December 25 (VIII Kal. Jan.) in connexion with the worship of the Sun-God Mithra, appears to have been instituted in this special form by Aurelin about A.D. 273. and to this festival the day owes its opposite name of Birth-day of the Unconquered Sun, "Dies Natalis Soils Invicti". With full symbolic appropriateness, though not with historical justification, the day was adopted in the Western Church, where it appears to have been generally introduced in the fourth century, and whence in time passed to the Eastern Church, as the solemn anniversary of the birth of Christ, the Christian Dies Natalis, Christmas day. Attempts have been made to ratify this date as a matter of history, but no valid or even consistent Christian tradition vouches for it, The real origin of the festival is clear from the writings of the Fathers after its institution. In religious symbolism of the material and spiritual Sun, Augustine and Gregory Nyassa discourse on the glowing light and dwindling darkness that follow the Nativity, while Leo the Great, among whose people the earlier Solar meaning of the festival remained in strong remembrance, rebukes in a sermon the pestiferous persuasion, as he calls it, that this solemn day is to be honoured not for the birth of Christ, but for the rising, as they say, of the new sun.
Tylor's Primitive Culture, Vol. II, p. 297-8.

টেলর সাহেব নোটে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাঁহাদিগের সে প্রমাণগুলি বিস্তারিত দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা তাঁহার ঐ নোটের লিখিত গ্রন্থগুলি পড়িয়া দেখিবেন। নোটে ছয়খানি গ্রন্থের নাম আছে।

সবিতা ও গায়ত্রী

আকাশ-দেবতাদিগের কথা বলিয়াছি। তার পর সূর্য্য-দেবতাদিগের কথা বলিতেছিলাম। সূর্য্য-দেবতা, সূর্য্য, ভগ, অর্য্যমা, পূষা, মিত্র, সবিতা, বিষ্ণু। ইহার মধ্যে সূর্য্যের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই-চেনা জিনিষ। ভগ, অর্য্যমা, পূষা ও মিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা গিয়াছে। বিষ্ণুর কথা এখন বলিব না-পৌরাণিক তত্ত্বের আলোচনায় তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হইবে। অতএব এক্ষণে কেবল সবিতাই আমাদের আলোচ্য।

কিন্তু সবিতাকে লইয়া বড় গোলযোগ। সূর্য্যের নাম সবিতা, ইহা বালকেও জানে। কিন্তু প্রসিদ্ধ গায়ত্রী নামক মন্ত্রে যেখানে সবিতা আছেন ("তৎসবিতু") সেখানে তিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বলিয়া পরিচিত, অনেকেই সবিতা অর্থে জগৎস্রষ্টাকেই বুঝেন। এ কথা আমাদের বিচার্য্য। পূষা বা মিত্রের মত তাঁহাকে অপ্রচলিতের মধ্যে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিতে পারি না-কেন না, তিনি আর্য্য ব্রাহ্মণের উপর বড় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যে গায়ত্রীকে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের ব্রাহ্মণ্যের ও উপাসনার সার ভাগ মনে করেন, তিনি সেই গায়ত্রীর দেবতা। গায়ত্রী কেবল তাঁরই স্তব। সুতরাং এ কথাটা আগে মীমাংসার প্রয়োজন-তিনি কেবল একটা বৃহৎ জড়পিণ্ড, না সর্ব্বস্রষ্টা, অনন্তচৈতন্য পরমেশ্বর? আমরা নিরপেক্ষ হইয়া এ বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা করিব। আমরা সবিতাকে সূর্য্য-দেবতা মধ্যে গণিয়াছি বটে, কিন্তু সে মতের বিরুদ্ধে কতকগুলি কথা আছে, তাহাও দেখাইতে হইবে।

"সু" ধাতু হইতে সবিতৃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তবেই সবিতা অর্থে প্রসবিতা। কাহার প্রসবিতা? নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, "সর্ব্বস্য প্রসবিতা"। সায়নাচার্য্য গায়ত্রীর ব্যাখ্যা কালে "তৎসবিতুঃ" ইতি বাক্যের অর্থ করেন, "জগৎপ্রসবিতুঃ"। যদি তাই হয়, তাহা হইলে সবিতা, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও "তৎসবিতুঃ" শব্দের ব্যাখ্যা পরব্রহ্ম পক্ষে করিয়া থাকেন। বেদের এক স্থানে তাঁহাকে "প্রজাপতি" বলা হইয়াছে। আর এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, কেহই তাঁহার

বিরোধী হইতে পারে না।* জলবায়ু তাঁহার আজ্ঞাকারী।† অন্য দেবতারা তাঁহার অনুযায়ী।‡ বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, অদিতি, ও বসুগণ তাঁহার স্তুতি করেন।§ তিনি প্রার্থনার বস্তু ঈশ্বর আমাদের কাম্য বস্তু সকল দান করেন। তিনি ভুবনের প্রজাপতি ; আকাশকে ধর্ত্তা (দিবো ধর্ত্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ।৫।৫৩।২।) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে যে, "প্রজাপতিঃ সবিতা ভূত্বা প্রজা অসৃজত"। সবিতা প্রজাপতি হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন। কথাগুলায় যেন কেবল পরমেশ্বরকেই বুঝায়।

পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রসবিতৃ শব্দ ঋগ্বেদে সূর্য্য প্রতিও এক স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে (৭।৬৩।২।)। ঋগ্বেদের সূক্তের একটি লক্ষণ এই যে, যখন যে দেবতা স্তুত হন, তখন তিনিই সকলের বড় হইয়া দাড়ান। সুতরাং সবিতার এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত দেখিয়াও কিছুই স্থির করা যায় না। সবিতা যে সূর্য্য, এমত বিবেচনা করিবার অনেকগুলি কারণ আছে।

১। ঋগ্বেদে অনেক স্থানে স্পষ্টই সূর্য্যার্থে সবিতৃ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা, ৪ ম, ১৪ সূ, ২ ঋকে।

২। সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার রূপ। সূর্য্যের মত তাঁহার কিরণ আছে। (প্রসুবন্নক্তুভির্জগৎ। ৪ম, ৫৩ সূ, ৩ ঋক্) সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার রথ আছে, অশ্ব আছে এবং সূর্য্যের ন্যায় তিনি আকাশ পরিভ্রমণ করেন।

৩। যাস্ক বলেন, যখন আকাশ হইতে অন্ধকার গিয়াছে, রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে, সেই সবিতার কাল।# সায়নাচার্য্য বলেন যে, উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি সেই সবিতা, উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি, সেই সূর্য্য।†† অতএব এই মত পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত।

৪। সবিতা যে পরব্রহ্ম নহেন, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে, পরব্রহ্মবাদীরা ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াই স্বীকার করেন, অথবা বিশ্বরূপ বলিয়া থাকেন, কিন্তু সবিতা অন্যান্য বৈদিক দেবতার ন্যায় সাকার। তিনি হিরণ্যাক্ষ্য, হিরণ্যহস্ত, হিরণজিহ্ব, হিরণ্যপাণি, পৃথুপাণি, সুপাণি, সুজিহ্ব, মন্দ্রজিহ্ব, হরিকেশ ইত্যাদি শব্দে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার বাহুর কথা অনেক বার কথিত হইয়াছে। (বাহু, কর মাত্র)।

বোধ হয় এখন স্বীকার করিতে হইবে যে, সবিতা, পরব্রহ্ম নহেন, জড়পিণ্ড সূর্য্য। তবে গায়ত্রীর সেই "তৎসবিতুঃ" শব্দের অর্থ কি হইল? এত কাল কি ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রীতে সূর্য্যকেই ডাকিয়া আসিতেছে, পরব্রহ্মকে নয়? যে গায়ত্রী না জপিয়া ব্রাহ্মণকে জলগ্রহণ করিতে নাই, যে গায়ত্রী জপ করিয়া ব্রাহ্মণ মনে করেন, আমি পবিত্র হইলাম, আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল-সে কি কেবল জড়পিণ্ড সূর্য্যের কথা, জগদীশ্বরের নহে?

ব্রাহ্মণে এমন ভাবে না। এমন ভাবিতে ব্রাহ্মণের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মপক্ষে গায়ত্রীর কিরূপ অর্থ করেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের কৃত ব্যাখ্যা নোটে উদ্ধৃত করিলাম।* কিন্তু এখনকার ব্রাহ্মণেরা যাই বলুন, এইরূপ ব্যাখ্যাই কি প্রকৃত ব্যাখ্যা? গায়ত্রী সামগ্রীটা কি, তাহা বুঝিলেই গোল মিটিতে পারে।

গায়ত্রী আর কিছুই নহে। ঋগ্বেদের একটি ঋক্। তৃতীয় মণ্ডলে দ্বিষষ্টিতম সূক্তের ১৮টি ঋক আছে ; তন্মধ্যে দশম ঋক্ গায়ত্রী। ঐ সূক্তটি সমুদায় উদ্ধৃত করিতে হইতেছে, নহিলে পাঠক "গায়ত্রীর" মর্ম্ম বুঝিবেন না।

এই সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র। ইন্দ্রাবরুণৌ (ইন্দ্র ও বরুণ একত্রে) বৃহস্পতি, পূষা, সবিতা, সোম, মিত্রাবরুণৌ (মিত্র ও বরুণ একত্রে) এই সূক্তের দেবতা। অর্থাৎ বিশ্বামিত্র এই সূক্তে বক্তা (প্রণেতা) এবং ইন্দ্রাদি দেবতা ইহাতে স্তুত হইয়াছেন। ঐ স্তুত দেবতাদিগের মধ্যে সবিতা এক জন। যে ঋক্‌টিকে গায়ত্রী বলা যায়, তাহা তাঁহারই স্তব।

সূক্তটি এই-

"ইমা উ বাং ভৃময়ো মন্যমানা যুবাবতে ন তুজ্যা অভুবন্।
ক্বত্যদিন্দ্রাবরুণা যশো বাং যেন স্মা সিনং ভর্থঃ সখিভ্যঃ ‖ ১ ||
অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীয়ঞ্ছশ্বত্তমমবসে জোহবীতি।
সজোষাবিন্দ্রাবরুণা মরুদ্ভির্দ্দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবং মে ‖ ২ ||
অস্মে তদিন্দ্রাবরুণা বসু ষ্যাদস্মে রয়িৰ্ম্মরুতঃ সর্ব্ববীরঃ।
অস্মান্ বরুত্রীঃ শরণৈরবস্ত্বস্মান্ হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ‖ ৩ ||
বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য।

রাস্ব রত্নানি দাশুষে ॥ ৪ ||
শুচিমর্কর্বৃস্পতিমধ্বরেষু নমস্যত।
অনাম্যোজ আ চকে ॥ ৫ ||
বৃষভং চর্য্যণীনাং বিশ্বরূপমদাভ্যং।
বৃহস্পতিং বরেণ্যং ॥ ৬ ||
ইয়ং তে পূষান্নাঘৃণে সুষ্টুতির্দ্দেব নব্যসী।
অস্মাভিস্তুভ্যং শস্যতে ॥ ৭ ||
তাং জুষস্ব গিরং মম বাজয়ন্তীমবা ধিয়ং।
বধূয়ুরিব ঘোষণাং || ৮ ||
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি।
স নঃ পূষাবিতা ভুবৎ ॥ ৯ ||
তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১০ ||
দেবস্য সবিতুর্ব্বয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধ্যা।
ভগস্য রীতিমীমহে ॥ ১১ ||
দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সুবৃক্তিভিঃ।
নমস্যান্তি ধিয়েষিতাঃ ॥ ১২ ||
সোমো জিগাতি গাতুবিৎ দেবনামেতি নিষ্কৃতং।
ঋতস্য যোনিমাসদং ॥ ১৩ ||
সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে।
অনমীবা ইষস্করৎ ॥ ১৪ ||
অস্মাকমায়ুর্ব্বর্ধয়ন্নভিমাতীঃ সহমানঃ।
সোমঃ সধস্থমাসদৎ ॥ ১৫ ||
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতং।
মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ ॥ ১৬ ||

উরুশংসা নমোবৃধা মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ।
দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা ১৭ ||
গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদতং।
পাতং সোমমৃতাবৃধা ‖ ১৮ ||

শেষ ৪ ঋকের ঋষি কোন কোন মতে জমদগ্নি। অস্যার্থ।

হে ইন্দ্র ও বরুণদেব! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় মান্যমান এবং ভ্রমণশীল এই প্রজাগণ যুবা এবং বলবান্ রিপুকর্ত্তৃক যেন বিনষ্ট না হয়। আপনাদিগের তাদৃশ যশ আর কোথায় আছে, সে যশঃদ্বারা সখিভূত আমাদিগকে অন্নপ্রদান করে। ১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! ধনেচ্ছু মহান্ যজমান রক্ষার নিমিত্ত আপনাদিগকে আহ্বান করেন। মরুদ্গণ, দ্যুলোক ও পৃথিবীর সহিত সংগত হইয়া আপনারা আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। ২। হে দেবদ্বয়! আমরা যেন সেই অভিলষিত বসু এবং সেই সর্ব্বকর্ম্মকরণে সামর্থবিধায়ক অর্থ প্রাপ্ত হই। সকলের বরণীয় দেবপত্নীগণ রক্ষার সহিত এবং হবনীয় সরস্বতী গোরূপ দক্ষিণার সহিত আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩। হে সর্ব্বদেবহিত বৃহস্পতে! আমাদিগের হব্যাদি গ্রহণ করুন এবং আমাদিগকে ধনদান করুন। ৪। হে ঋত্বিক্গণ! বৃহস্পতিদেবকে তোমরা স্তোত্রদ্বারা নমস্কার কর। আমরা তাঁহার অনভিভবনীয় তেজের স্তুতি করিতেছি। ৫। মনুষ্যদিগের অভিমত ফলদাতা অনভিভবনীয় এবং ব্যাপ্তরূপ বরেণ্য বৃহস্পতিকে নমস্কার কর। ৬। হে দীপ্তিমান্ পূষণ্! এই নূতন স্তুতি আপনার উদ্দেশে কীর্ত্তন করিতেছি। ৭। হে পূষণ্, স্তুতিকারক আমার এই স্তুতি গ্রহণ করুন এবং স্তুতিদ্বারা প্রীত হইয়া অন্ন ইচ্ছাকারিণী ও হর্ষকারিণী এই স্তুতি গ্রহণ করুন, যেমন স্ত্রীকামী পুরুষ স্ত্রীকে গ্রহণ করে। ৮। যে পূষাদেব বিশ্বজগৎ দর্শন করেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৯। সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। ১০। অন্ন ইচ্ছা করিয়া আমরা স্তুতির সহিত সবিতৃদেবের এবং ভগদেবের দান প্রার্থনা করি। ১১। নেতৃ বিপ্রগণ যজ্ঞে শোভন স্তুতিদ্বারা সবিতৃদেবকে বন্দনা করে। ১২। পথপ্রদর্শক সোমদেব দেবগণের সংস্কৃত আবাসে এবং যজ্ঞস্থানে গমন করেন।

১৩। সোমদেব আমাদিগকে এবং সর্ব্বপ্রাণীকে অনাময়প্রদ অন্ন প্রদান করুন। ১৪। সোমদেব আমাদিগের আয়ুর্ব্বর্দ্ধন এবং পাপনাশ করিয়া হবির্ধানপ্রদেশে আগমন করুন। ১৫। হে শোভনকর্ম্মশীল মিত্র ও বরুণদেব! আপনারা আমাদিগের গাভীসকলকে দুগ্ধপূর্ণ করুন এবং জল মধুররসবিশিষ্ট করুন। ১৬। বহুস্তুত এবং স্তুতিবৃদ্ধ শুদ্ধব্রত আপনারা দীর্ঘস্তুতিদ্বারা বলের ঈশ্বর হয়েন। ১৭। জমদগ্নি ঋষি কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া যজ্ঞবর্দ্ধক আপনারা যজ্ঞস্থলে আগমন করুন এবং সোম পান করুন। ১৮। এখন দেখা যাইতেছে, যখন ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, সোমাদির সঙ্গে একত্রেই সবিতা স্তুত হইয়াছেন, তখন সবিতা পরব্রহ্ম না হইয়া সূর্য্য হইবার সম্ভাবনা। একাদশ ঋক্‌টিও সবিতৃস্তব। ঐ ঋকে সবিতার সঙ্গে ভগদেবও যুক্ত হইয়াছেন। অতএব উভয়েই সূর্য্যের মূর্ত্তিবিশেষ, ইহাই সম্ভব। পাঠক দেখিবেন যে, ঋক্‌টিকে গায়ত্রী বলা যায় (দশম ঋক্) তাহার পূর্ব্বে “ভূ” “ভুব” “স্বর্” এ তিনটি শব্দ নাই। গায়ত্রীর পূর্ব্বে এই তিনটি শব্দ সচরাচর উচ্চারিত হওয়ার নিয়ম থাকায়, অনেকে মনে করেন, “তৎসবিতা” অর্থে, এই ত্রৈলোক্যের প্রসবিতা।

এই ঋক্‌টির গায়ত্রী নাম হইল কেন? গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম। এই ৬২তম সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক ত্রিষ্টুপ ছন্দে। আর ১৫টি গায়ত্রীচ্ছন্দে। এই ঋক্‌টির প্রাধান্য আছে বলিয়াই ইহাই গায়ত্রী নামে প্রচলিত। এই প্রাধান্য, ইহার অর্থগৌরব হেতু। সত্য বটে যে, সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যা করিলে তত অর্থগৌরব থাকে না। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যখন ভারতবর্ষে প্রধান ঋষিরা ব্রহ্মবাদী হইলেন, আর তাঁহারা ব্রহ্মবাদ বেদমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন গায়ত্রীর অর্থ ব্রহ্মপক্ষেই করিলেন। এবং সেই অর্থই ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে প্রচলিত হইল।

ইহাতে ক্ষতি কি? ব্রাহ্মণেরাই বা লাঘব কি? গায়ত্রীরই বা লাঘব কি? যে ঋষি গায়ত্রী প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তিনি যে অর্থই অভিপ্রেত করিয়া থাকুন না, যখন ব্রহ্মপক্ষে তাঁহার বাক্যের সদর্থ হয়, আর যখন সেই অর্থেই গায়ত্রী সনাতন ধর্ম্মোপযোগী এবং মনুষ্যের চিত্ত-শুদ্ধিকর, তখন সেই অর্থই প্রচলিত থাকাই উচিত। তাহাতে ব্রাহ্মণেরও গৌরব, হিন্দুধর্ম্মেরও গৌরব। এই অর্থে ব্রাহ্মণ শূদ্র, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টীয়ান্ সকলেই গায়ত্রী জপ করিতে পারে। তবে আদৌ বৈদিক ধর্ম্ম কি ছিল, তাহার যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা হইতে কি প্রকারে

বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে, এই তত্ত্বগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝান আমাদের চেষ্টা, তাই গোড়ার কথাটা লইয়া আমাদের এত বিচার করিতে হইল। বৈদিক ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের মূল, কিন্তু মূল বৃক্ষ নহে ; বৃক্ষ পৃথক্ বস্তু। বৃক্ষ যে শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্পে ফলে ভূষিত, মূলে তাহা নাই। কিন্তু মূলের গুণাগুণ না বুঝিলে, আমরা বৃক্ষটিও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না।-'প্রচার, ১ম বর্ষ, পৃ. ২২৮-৩৭।

------

* নকিরস্য তানি ব্রতা: দেবস্য সবিতুর্ম্মিনন্তি। ন যস্য ইন্দ্রো বরুণো ন মিত্রো ব্রতং অর্য্যমান্ মিনন্তি রুদ্রা:। অস্যহি সর্ব্বশাস্তারাং সবিতু: কচ্চন প্রিয়ং। ন মিনন্তি স্বরাজ্যং ২। ৩৮। ৭। ৯। -৫। ৮২। ২

† আপশ্চিদস্য ব্রতে আনিমৃগ্রা অয়শ্চিৎ বাতো রমতে পরিজ্মন্।২। ৩৮। ২।

‡ যস্য প্রয়ানমন্বয়ে ইদ্যিযুর্দেবা:।৫। ৮১। ৩।

§ অপি স্তুত: সবিতা দেবো অস্তুয়ং আচিদ্বিশ্বেবসবো গৃণান্তি। অভি যং দেবী অদিতির্গণাতি সবং দেবস্য সবিতুর্জুষাণা। অভিসম্রাজো বরুণো গৃণন্তি অভিমিত্রাসো অর্য্যমা। সযোষা:।৭। ৩৮। ৩, ৪।

তস্য কালো যদা দ্যৌরপহততমস্কাকীর্ণরশ্মির্ভবতি।

†† উদয়াৎ পূর্ব্বভাষী সবিতা। উদয়াস্তমধ্যবর্ত্তী সূর্য্য ইতি। * "গায়ত্র্যা অর্থমাহ যোগী যাজ্ঞবল্ক্য:। দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরণ্যেঞ্চাস্য ধীমহি। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো ন: প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তী: পুন: পুন:। বুদ্ধেশ্চেদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্। বরণ্যেং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভি:। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যংতন্মুমুক্ষভি:। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দু:খস্য ত্রিয়তস্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্য: সূর্য্যমণ্ডলে। মন্ত্রার্থমপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেবহি। তেন গায়ত্র্যা

অয়মর্থ:। দেবস্য সবিতুর্ভর্গস্বরূপান্তর্য্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভি: তদ্বিনাশায় উপাসনীয়ং। ধীমহি প্রাগুক্তেন সোহহস্মীত্যনেন চিন্তায়াম:, যো ভর্গ: সর্ব্বান্তর্য্যামীশ্বরো নোহস্মাকং সর্ব্বেষাং সংসারিণং ধিয়ো বুদ্ধী: প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি। তথাচ ভগবদ্গীতায়াং। "ঈশর: সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি, ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" ঈশ্বরোহন্তর্য্যামী হৃদ্দেশে অন্ত:করণে ভ্রাময়ন্ তত্তৎকর্ম্মসু প্রেরয়ন্ দারুযন্ত্রতুল্যশরীরারূঢ়ানি ভূতানি প্রাণিনো জীবানিতি যাবৎ মায়য়া অঘটনঘটনপটীয়স্যা নিজশক্ত্যা। তথাচাশ্বতরাণাং মন্ত্র:। "একো দেব: সর্ব্বভূতেষু গূঢ় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষ: সর্ব্বভূতাধিবাস: সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।"

বৈদিক দেবতা

এক্ষণে আমরা অবশিষ্ট বৈদিক দেবতাদিগের কথা সংক্ষেপে বলিব। আমরা আকাশ ও সূর্য্যদেবতাদিগের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে বায়ু-দেবতাদিগের কথা বলিব। বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। বায়ু দেবতা,-প্রথম বায়ু বা বাত, দ্বিতীয় মরুদ্গণ। বায়ুর বিশেষ পরিচয় কিছুই দিবার নাই। সূর্য্যের ন্যায় বায়ু আমাদিগের কাছে নিত্য পরিচিত। ইনি পৌরাণিক দেবতার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। পুরাণেতিহাসে ইন্দ্রাদির ন্যায় ইনি একজন দিক্পাল মধ্যে গণ্য। এবং বায়ু বা পবন নাম ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাকে প্রচলিত দেবতাদের মধ্যে ধরিতে হয়।

মরুদ্গণ সেরূপ নহেন। ইঁহারা এক্ষণে অপ্রচলিত। বায়ু সাধারণ বাতাস, মরুদ্গণ ঝড়। নামটা কোথাও একবচন নাই ; সর্ব্বত্রই বহুবচন। কথিত আছে যে, মরুদ্গণ ত্রিগুণিত ষষ্টিসংখ্যক, একশত আশী। এ দেশে ঝড়ের যে দৌরাত্ম্য, তাহাতে এক লক্ষ আশী হাজার বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। ইঁহাদিগকে কখন কখন রুদ্র বলা হইয়া থাকে। রুদ্ ধাতু চীৎকারার্থে রুদ্ ধাতু হইতে রোদন হইয়াছে। রুদ্ ধাতুর পর সেই “র” প্রত্যয় করিয়া রুদ্র শব্দ হইয়াছে। ঝড় বড় শব্দ করে, এই জন্য মরুদ্গণকে রুদ্র বলা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কোথাও বা মরুদ্গণকে রুদ্রের সন্ততি বলা হইয়াছে।

তার পর অগ্নিদেবতা। অগ্নিও আমাদের নিকট এত সুপরিচিত যে, তাঁহারও কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কিছু পরিচয় দেওয়াই হইয়াছে।

ঋগ্বেদে আর একটি দেবতা আছেন, তাহাকে কখন বৃহস্পতি কখন ব্রহ্মণস্পতি বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, ইনি অগ্নি, কেহ কেহ বলেন, ইনি ব্রহ্মণ্যদেব। সে যাহাই হউক। ব্রহ্মণস্পতির সঙ্গে আমাদের আর বড় সম্বন্ধ নাই। বৃহস্পতি এক্ষণে দেবগুরু অথবা আকাশের একটি তারা। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে বড় বিশেষ বলিবার প্রয়োজন নাই।

সোমকে এক্ষণে চন্দ্র বলি, কিন্তু ঋগ্বেদে তিনি চন্দ্র নহেন। ঋগ্বেদে তিনি সোমরসের দেবতা।

অশ্বীদ্বয় পুরাণেতিহাসে অশ্বিনীকুমার বলিয়া বিখ্যাত। কথিত আছে যে, তাঁহারা সূর্য্যের ঔরসে অশ্বিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদিগের পৌরাণিক নাম অশ্বিনীকুমার। এমন বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে, তাঁহারা শেষরাত্রির দেবতা ; ঊষার পূর্ব্বগামী দেবতা।

আর একটি দেবতা ত্বষ্টা। পুরাণেতিহাসে বিশ্বকর্ম্মা যাহা, ঋগ্বেদে ত্বষ্টা তাহাই। অর্থাৎ দেবতাদিগের কারিগর।

যমও ঋগ্বেদে আছেন কিন্তু যমও আমাদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত। যমদেবতার একটি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, তাহা সময়ান্তরে বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে।

ত্রিত আপ্ত্য অজ একপাদ প্রভৃতি দুই একটি ক্ষুদ্র দেবতা আছেন, কখন কখন বেদে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে এমন কিছুই কথা নাই যে, তাঁহাদের কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন করে।

বৈদিক দেবীদিগের মধ্যে অদিতি পৃথিবী এবং ঊষা এই তিনেরই কিঞ্চিৎ প্রাধান্য আছে। অদিতি ও পৃথিবীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। ঊষার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, কেন না, যাহার ঘুম একটু সকালে ভাঙ্গিয়াছে সেই তাহাকে চিনে। সরস্বতীও একটি বৈদিক দেবী। তিনি কখন নদী কখন বাগ্‌দেবী। গঙ্গা-সিন্ধু প্রভৃতি ঋগ্বেদে স্তুত হইয়াছেন। ফলতঃ ক্ষুদ্র বৈদিক দেবীদিগের সবিস্তার বর্ণনে কালহরণ করিয়া পাঠকদিগকে আর কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এইখানে বৈদিক দেবতাদিগের ব্যক্তিগত পরিচয় সমাপ্ত করিলাম। কিন্তু আমরা বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করিলাম না। আমরা এখন বৈদিক দেবতাতত্ত্বের স্থূল মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিব। তার পর বৈদিক ঈশ্বরতত্ত্বে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করি।-'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ২৬৬-৬৮।

দেবতত্ত্ব

আমরা দেখিয়াছি যে, বেদের ইন্দ্রাদি দেবতারা কেহ বা আকাশ, কেহ বা সূর্য্য, কেহ বা অগ্নি, কেহ বা নদী ; এইরূপ অচেতন জড়পদার্থ মাত্র। বেদে এইরূপ অচেতন জড়পদার্থের উপাসনা কেন? এরূপ উপাসনা কোথা হইতে আসিল? ইহার উৎপত্তির কি কোন কারণ আছে? অদ্য এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কেবল বৈদিক হিন্দুরাই এই ইন্দ্রাদির উপাসনা করিতেন না। পৃথিবীর অনেক সভ্য এবং অসভ্য জাতি ইঁহাদিগের উপাসনা করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। সেই সকল জাতিমধ্যে এই দেবতাদিগের নাম ভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু উপাস্য দেবতা একই। আমরা কেবল প্রাচীন আর্য্যজাতিসম্ভূত যেন, রোমক প্রভৃতি জাতিদিগের কথা বলিতেছি না। হিন্দুরা যে জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারাও সেই জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ; সুতরাং একই বংশে একই দেবতার উপাসনা যে প্রচলিত থাকিবে ইহা বিস্ময়কর নহে। বিস্ময়কর এই যে, সকল জাতির সঙ্গে আর্য্যবংশীয়দিগের বংশত, স্থানগত, বা অন্য কোনপ্রকার ঐতিহাসিক সম্বন্ধ নাই, তাহাদিগের মধ্যেও এই ইন্দ্রাদির উপাসনা প্রচলিত। আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া বা পলিনেসিয়ার অভ্যন্তরবাসীদিগের মধ্যেও এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা প্রচলিত। আমরা কতকগুলি উদাহরণ দিব। অধিক উদাহরণ সঙ্কলনের জন্য প্রচারের স্থান নাই। উদাহরণ দিবার পূর্ব্বে আমাদিগের দুইটি কথা বলিবার আছে।

প্রথম, হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যায় আমরা পাশ্চাত্ত্য লেখকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক। ইংরেজভক্ত পাঠকদিগের তুষ্টির জন্য দুই একবার আপন মতের পোষকতায় পাশ্চাত্ত্য লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়াছি বটে, কিন্তু সে অনিচ্ছাপূর্ব্বক। এবং আপনার মতের সঙ্গে তাহাদিগের মত না মিলিলে সেরূপ সাহায্য গ্রহণ করি নাই। কিন্তু এখানে ইউরোপের সাহায্য ব্যতীত আমাদের চলিবার উপায় নাই, কেন না কোন হিন্দুই আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পলিনেসিয়ার আদিবাসীদিগকে দেখিয়া আইসে নাই।

দ্বিতীয়, আমরা প্রধানতঃ অসভ্য জাতিদিগের মধ্য হইতেই অধিকাংশ উদাহরণ গ্রহণ করিব। ইহাতে কেহ মনে না করেন যে, আমরা হিন্দুদিগকে অথবা প্রাচীন বৈদিক হিন্দুদিগকে, অসভ্য জাতি মধ্যে গণ্য করি। ইহা আমরা বলিতে স্বীকৃত আছি যে, বৈদিক হিন্দুরা যে সকল কথা বুঝিয়াছিলেন, ইউরোপে সভ্য জাতিরাও তাহার অনেক কথা এখনও বুঝেন নাই। তবে সাদৃশ্য এই যে, বৈদিক ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের প্রথম অবস্থা, আর আমরা যে সকল অসভ্য জাতিদের কথা বলিব, তাহাদেরও ধর্ম্মের প্রথম অবস্থা।

এক্ষণে আমরা উদাহরণ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। প্রথমতঃ ইন্দ্রদেবতাই আমাদের উদাহরণ হউন। প্রমাণ করিয়াছি যে, ইন্দ্র বৃষ্টি-দেবতা। শ্বেত-নীল-নদীতীরবাসী দিঙ্ক নামে জাতি ইন্দ্রকে দেন্দিদ নামে উপাসনা করে। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি-দেবতা এবং ইন্দ্রের ন্যায় স্বর্গবাসী প্রধান দেবতা। ‘ডমর’ নামে অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে ‘ওমাকুরু’ নামে দেবতা বৃষ্টিদেবতাও বটে, সর্ব্বপ্রধান দেবতাও বটে। ইনিই ডমরদিগের ইন্দ্র। আমেরিকার আদিম জাতিদিগের মধ্যে দুইটি সভ্যজাতি ছিল,-মেক্সিকোর আদিবাসী ‘অজতেক’ এবং পিরু’র আদিমবাসী ‘ইঙ্কা’দিগের প্রজা। অজতেকেরা তলালোকের উপাসনা করিত। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় আকাশ-দেবতা এবং ইন্দ্রের বৃষ্টি-দেবতা এবং ইন্দ্রের ন্যায় বজ্রী। পিরুবাসীদিগের মধ্যে ইন্দ্র, দেব নহেন, দেবী। নিকারগুয়াবাসীদিগের মধ্যে বৃষ্টি-দেবতার পূজা আছে। ভারতবর্ষীয় অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে উড়িষ্যার খন্দেরা পিজ্জুপেন্নু নামে বৃষ্টি-দেবতা পূজা করে। কোলেদের বড় পর্ব্বতকে তাহারা মরংবুরু বলে। তিনিই ইহাদের বৃষ্টি-দেবতা। পূর্ব্বে আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি যে, রোমকদিগের জুপিটার আমাদিগের দ্যৌষ্পিতৃ। কিন্তু দ্যৌঃ ত কেবল আকাশ, রোমকেরা কেবল আকাশের উপাসনায় সন্তুষ্ট নহেন। বৃষ্টিকারী আকাশের উপাসনা চাই। এইজন্য তাঁহারা জুপিটার প্লুবিয়স, অর্থাৎ বৃষ্টিকারী আকাশের উপাসনা করিতেন। ইনি রোমকদিগের ইন্দ্র।

অগ্নিকে দ্বিতীয় উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। পৃথিবীতে, বিশেষতঃ আশিয়া প্রদেশে, অগ্নির উপাসনা বড় প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমেরিকার দিলাবরেরা অগ্নিদেবতাকে আমেরিকার আদিমবাসীদিগের আদি পুরুষ (মনু) বলিয়া বৎসরে বৎসরে উপাসনা করে। অর্ভিঙের লিখিত পুস্তকে জানা যায় যে, চিনুক নামে আমেরিকার

প্রান্তবাসী আদিমজাতিরা অগ্নির পূজা করিত। সভ্য মেক্সিকোবাসীদিগের মধ্যে অগ্নি একজন প্রধান দেবতা ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার নামটি এত দুরুচ্চার্য্য যে, আমরা তাহা বাঙ্গালায় লিখিতে পারিলাম না।1 পলিনেসিয়াতে মহুইকা নামে এবং আফ্রিকার ডাহোমে প্রদেশে জো নামে অগ্নি পূজিত। আশিয়া প্রদেশে কঞ্চড়লেরা শব পূজা করে এবং অগ্নিও পূজা করে। জাপান প্রদেশস্থ য়েসো প্রদেশে অগ্নিই প্রধান দেবতা। তুঙ্গজ মোগল এবং তুর্ক জাতীয়েরা অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকে। টইলর সাহেব মোগলদিগের2 একটি বিবাহমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া ঋগ্বেদের অগ্নিসূক্ত মনে পড়ে।

ইতিহাসে বিখ্যাত আসিরিয়া, কালদিয়া, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের লোকেরা প্রধানতঃ অগ্নির উপাসক ছিল। প্রাচীন পারস্যবাসীরা বিখ্যাত অগ্নির উপাসক এবং তাহাদিগের বংশ, বোম্বাইয়ের পার্সীর অদ্যাপিও বিখ্যাত অগ্নির উপাসক। ইউরোপেও গ্রীকদিগের মধ্যে Vulcan, Hephaistos, Hestia অগ্নিদেবতা। তৎপরবর্ত্তী ইউরোপীয়দের মধ্যে একটু একটু অগ্নিপূজা আছে। উদাহরণস্বরূপ টইলর সাহেবের গ্রন্থ হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম।!

সূর্য্যোপাসনা জগতে অতিশয় বিস্তৃত। সভ্য এবং অসভ্য সকলেই তাঁহার উপাসনা করে। আমেরিকায় অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে হডসন বের উপকূলবাসী আদিমজাতিরা প্রাতঃসূর্য্যের উপাসনা করে। বঙ্কুবর দ্বীপবাসীরা মধ্যাহ্নসূর্য্যের উপাসনা করে। দিলাবরদিগের দ্বাদশ দেবতার মধ্যে সূর্য্য দ্বিতীয় দেবতা। বর্জিনিয়ার আদিমবাসীরা উদয় এবং অস্তকালে সূর্য্যের উপাসনা করিত। পোত্তবিতুমিরা ছাদের উপর উঠিয়া সূর্য্যের ভোগ দিত। আলগোঙ্কুইনদিগের চিত্রলিপি মধ্যে সূর্য্যের চিত্র প্রধান দেবতার চিত্রের স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। সিউস জাতিরা সূর্য্যকে জগতের সৃজনকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা স্বরূপ বিবেচনা করে। ক্রীক্ জাতিরা সূর্য্যকে ঈশ্বরের প্রতিমাস্বরূপ বিবেচনা করে। আরৌকানিয়েরা সূর্য্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। পুয়েল্চেরা সূর্য্যের নিকট সকল মঙ্গল কামনা করে। টুকুমানবাসীরা সূর্য্যের মন্দির গঠন করিয়া, তন্মধ্যে তাঁহার উপাসনা করে। লুইসিয়ানাবাসী নাচেজ জাতিদিগের মধ্যে সূর্য্যের পুরোহিতেরাই রাজা হইত এবং সূর্য্যের মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক রীতিমত প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করিত।

ফ্লোরিদার আদিমবাসী অপলশেরা প্রকৃত সৌর ছিল। তাহারা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সূর্য্য উপাসনা করিত এবং বৎসরে চারিবার সূর্য্যের উৎসব করিত। এদেশে দুর্গাপূজায় যেমন ঘটা, মেক্সিকো নিবাসী অজতেকদিগের মধ্যে সূর্য্যপূজার সেইরূপ ঘটা ছিল। তাহাদিগের নির্ম্মিত সূর্য্যের বৃহৎ স্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং প্রেস্কটের মনোহর রচনায় এই সূর্য্যের ভীষণ উপাসনা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ সূর্য্যকেই অজতেকেরা ঈশ্বর বলিয়া মানিত। দক্ষিণ আমেরিকার বেগোটা নিবাসী মুইস্কা জাতিরা সূর্য্যর নিকট নরবলি দিত। পিরুর সূর্য্যোপাসনা অতি বিখ্যাত এবং পিরুবাসীদিগের জীবনের সমস্ত কর্ম্ম এই সূর্য্যোপাসনার দ্বারা শাসিত হইত। পিরুর রাজা আমাদিগের রামচন্দ্রাদির ন্যায় সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা সূর্য্যের প্রতিনিধি বলিয়া রাজত্ব করিতেন। পিরুদেশে স্বর্ণ খচিত অসংখ্য সূর্য্যমন্দিরে সূর্য্যের স্বর্ণনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সকল সর্ব্বলোকের দ্বারা উপাসিত হইত।

ভারতবর্ষীয় অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বোড়ো ও ধীমাল জাতিরা সূর্য্য উপাসনা করে। বাঙ্গালার প্রান্তবাসী কোল, মুণ্ডা, ওরাঁও এবং সাঁওতাল জাতিরা সিংবোঙ্গা নামে সূর্য্যদেবের উপাসনা করে। উড়িষ্যার খন্দদিগের মধ্যে সূর্য্যেদেবের নাম বুড়াপেন্নু। তিনি স্রষ্টা এবং বিধাতা। তদ্ভিন্ন তাতার, মঙ্গল, তুঙ্গুজ, সাইবিরিয়াবাসীরা এবং লাপ জাতিরা সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকে।

আর্য্যজাতিদিগের মধ্যে প্রাচীন পারসিকদিগের সূর্য্যপাসনার কথা বলিয়াছি। গ্রীকদিগের মধ্যে সূর্য্যদেবতা হিলিয়স্ বা আপোলন নামে উপাসিত হইতেন। সক্রেটিস্ প্রভৃতিও তাঁহার উপাসনা করিতেন। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই বলেন যে, গ্রীক প্রভৃতি আর্য্যজাতিদিগের দেবোপাখ্যান সকল অধিকাংশই সৌরোপন্যাস- সূর্য্যরূপক। তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, পাঠকেরা তাহা অবগত থাকিতে পারেন।

প্রাচীন মিশরবাসীদিগের মধ্যে সূর্য্যোপাসনার বড় প্রাধান্য ছিল। বৈদিক হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহারাও সূর্য্যের নানা মূর্ত্তির উপাসনা করিতেন। এক মূর্ত্তি রা আর এক মূর্ত্তি ওসাইরিস, তৃতীয় মূর্ত্তি হার্পক্রোতি।3 প্রাচীন সিরীয়, ও আসিরীয় ও টিরীয়দিগের মধ্যে

সূর্য্য বালস্‌মেস্‌, বেল বা বাল নামে উপাসিত হইতেন। সিরিয়া হইতে সূর্য্যোপাসনা রোমকে আনীত হইয়াছিল। এই সূর্য্যদেবের নাম এলোগবল্‌। তাঁহার পুরোহিত হেলিওগবলস্‌ রোমকের একজন সম্রাট হইয়াছিলেন। পরে রোমক খৃষ্টান হইলেও খৃষ্টোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে সূর্য্যোপাসনা চলিয়াছিল এবং এখনও চলিতেছে। যেখানে সূর্য্যোপাসনা লুপ্ত হইয়াছে, সেখানেও খৃষ্টমাস্‌ প্রভৃতি উৎসবে তাঁহার উপাসনার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। পক্ষান্তরে, বিডুইন আরবেরা মুসলমান হইয়াও অদ্যাপি সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকে।

চতুর্থ উদাহরণস্বরূপ আমরা বায়ুদেবতাকে গ্রহণ করি। ইন্দ্রাগ্নিসূর্য্যের ন্যায় বায়ুরও উপাসনা বহুদেশে প্রচলিত। আলাগঙ্কুইন জাতিদিগের বায়ুদেবচতুষ্টয়ের উপাখ্যান লংফেলো কৃত Hiawatha নামক কাব্যে বর্ণিত আছে। দিলাবরদিগের দ্বাদশ দেবতার মধ্যে উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, এই চারিটি দেবতা চারি প্রকার বায়ু মাত্র। ইরকোয়া জাতিদিগের মধ্যে বায়ুর অধিপতি দেবতার নাম গাওঃ। বেদে যেমন বায়ু এবং মরুদ্গণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেবতা, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও তেমনি কোথাও বায়ু কোথাও মরুদ্গণ পূজিত। পলিনেসীয়দিগের মধ্যে মরুদ্গণের পূজা আছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান বেরোমতৌতরু এবং তৈরিবু। বন্ধুজন ঝড়ের সময় সমুদ্রে থাকিলে উহারা এই মরুদ্গণের পূজা করে। উহাদিগের বিশ্বাস, ঐ পূজায় প্রার্থনামত ঝড় বন্ধ হয় এবং প্রার্থনামত ঝড় উপস্থিত হয়। অষ্ট্রেলেসিয়ার উপদ্বীপ মধ্যে মৌই প্রধান দেবতা। তিনি কোন কোন স্থানে বায়ুদেবতা বলিয়া পূজিত হন। টাহিটিতে তিনি পূর্ব্ব বায়ু। নবজিল্যাণ্ডে তিনি বায়ুগণের শাসনকর্ত্তা। ফিন্‌জাতিদিগের প্রধান দেবতা উক্কো ঝড়ের অধিপতি। গ্রীকদিগের মধ্যে বোরিয়স্‌, জেফিরস এবং ইয়লস্‌ বায়ুদেবতা। হার্পিগণ মরুদ্দেবতা। স্ক্যাণ্ডিনেভীয়দিগের বিখ্যাত ওডিন মরুদ্দেবতা। এই মরুদ্দেবের পূজার চিহ্ন আজও ইউরোপে বর্ত্তমান আছে। কারিন্থিয়ার কৃষকেরা মাংসপূর্ণ কাষ্ঠপাত্র গাছে ঝুলাইয়া দিয়া বায়ুদেবতাকে ভোগ দেয়। জার্ম্মানির অন্তর্গত স্বাবিয়া, টাইরোল এবং উপর-পালাটিনেট প্রদেশে ঝড় হইলে ঝড়কে ঐরূপ মাংস উপহার দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করে।

বেদে বরুণ প্রধানতঃ আকাশদেবতা, কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে জলেশ্বর বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। পুরাণে তিনি কেবল জলেশ্বর। গ্রীকদিগের মধ্যে বরুণ এইরূপ দুই ভাগ হইয়াছেন। য়ুরেনস্ (Uranos) আকাশ বরুণ এবং পোসাইডন (Poseidon) বা নেপচুন (Neptune) জলবরুণ। অসভ্য জাতিদের মধ্যেও এই দ্বিবিধ বরুণের উপাসনা আছে। আকাশ বরুণের কথা আমরা পরে বলিব, এক্ষণে জলেশ্বর বরুণের কথা বলি। পলিনেসিয়া প্রদেশে তুয়ারাতাই এবং রুয়াহাতু এই দুই জলেশ্বর বরুণ উপাসিত হইয়া থাকেন। আফ্রিকায় বোসমান জাতিদিগের মধ্যে জলেশ্বরের পূজা খুব ধুমধামের সহিত হইয়া থাকে। আফ্রিকার অন্যান্য প্রদেশেও জলেশ্বরের পূজা আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় পিরুবাসীরা মামাকোচা নামে সমুদ্রদেবের পূজা করে। পূর্ব্ব আসিয়ার কামচকট্কা প্রদেশে মিৎক্ নামে জলেশ্বর উপাসিত হইয়া থাকেন। জাপানে দ্বিবিধ জলেশ্বর আছেন। স্থলমধ্যগত জলেশ্বরের নাম মিধসুনোকামি, এবং জলমধ্যগত জলেশ্বরের নাম জেবিসু।

আগামী সংখ্যায় আমরা আর দুইটি দেবতাকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিব। পরে যে তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এই সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিতেছি, তাহার অবতারণা করিব।- 'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ৩০১-১০।

----

1 Xiuhteuctli ; also Huchuctcoel.

2 আমরা যাহাদিগের মোগল বলি তাহারা যথার্থ মোগল নহে। আরব্য বা পারস্য হইতে আসিয়া যাহারা ভারতবর্ষে বাস করিয়াছে আমরা তাহাদিগকেই মোগল বলি। তাহারা মোগল নহে। মধ্য-আশিয়ায় মোগল নামে একটি ভিন্ন জাতি আছে।

! "The Esthonian bride consecrates her new hearth and home by an offering of money cast into the fire, or laid on the oven for Tule-Ema, fire mother. The Carinthian peasant will 'fodder' the fire to make it kindly and throw lard or dripping to it, that it may not burn his house. To the Bohemian it is a godless thing to spit into the fire, God's fire as he calls it. It is not right to throw away the crumbs after a meal, for they belong to the fire. Of every kind of dish some should be

given to the fire and if some runs over, It is wrong to scold, for it belongs to fire. It is because these rights are now so neglected that harmful fires so often break out." Primitive Culture, p. 285.

3 Harpokrates.

দ্যাবাপৃথিবী

আকাশের একটি নাম দ্যু বা দ্যৌঃ। নামটি এখনও আধুনিক সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। এই দ্যু বা দ্যৌ বেদে দেবতা বলিয়া স্তুত হইয়াছেন, ইহা বলিয়াছি। ইনি একজন আকাশ-দেবতা। ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ, বরুণ আবরণকারী আকাশ, অদিতি অনন্ত আকাশ। কিন্তু দ্যৌ বা দ্যু আকাশের কোন্ মূর্ত্তি-এ কথাটা বলা হয় নাই।

বেদে যেমন আকাশের স্তোত্র আছে, তেমনি পৃথিবীরও আছে। আকাশ দেব বলিয়া, পৃথিবী দেবী বলিয়া স্তুত হইয়াছেন। একটি কাজের কথা এই যে, এই দ্যু বা দ্যৌ, আর এই পৃথিবী, একত্রে এক সূক্তেই স্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তনাম দ্যাবাপৃথিবী।

আরও কাজের কথা এই যে, কেবল তাঁহারা একত্রে স্তুত হইয়াছেন, এমত নহে, তাঁহারা দম্পতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আকাশ পুরুষ, পৃথিবী স্ত্রী।

কেবল তাই নহে। এই দম্পতি সমস্ত জীবনের পিতা ও মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দ্যৌ পিতা, পৃথিবী মাতা। আজি আমরা পৃথিবীকে মা বলিয়া থাকি-বাঙ্গালা সাহিত্যেও "মাতর্ব্বসুমতি!" এমন সম্বোধন পাওয়া যায়। কিন্তু আকাশকে পিতা বলিয়া ডাকিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বৈদিক ঋষিরা যেমন পৃথিবীকে মাতা বলিতেন, তেমনি আকাশকে পিতা বলিতেন। "তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ।" (১,৮৩,৪) এই "পিতা দ্যৌঃ" বা "দ্যৌষ্পিতা" অর্থাৎ "দ্যৌষ্পিতৃ" শব্দ গ্রীকদিগের "Zeus Pater" এবং রোমকদিগের "Jupiter" ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে বলে, আকাশ পঞ্চভূতের একটি। কিন্তু ইহাই আদিম। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি। ঋগ্বেদসংহিতায় দর্শনশাস্ত্র নাই-অতএব ঋগ্বেদসংহিতায় এ সকল কথা নাই। কিন্তু তাহাতে আছে যে, আকাশ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা, "দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী।" "দ্যৌষ্পিতা পৃথিবী মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতৃর্ব্বসবো" ইত্যাদি।

তবেই, যেমন ইন্দ্র আকাশের বর্ষকমূর্ত্তি, বরুণ, আবরকমূর্ত্তি, অদিতি অনন্তমূর্ত্তি, দ্যু বা দ্যৌ তেমনি জনকমূর্ত্তি। মনুও বলিয়াছেন, "মাতা পৃথিব্যাঃ মূর্ত্তিঃ।"

এখন আধুনিক বিজ্ঞানে এমন কথা বলে না যে, আকাশ এই বিশ্বব্যাপী জীবপুঞ্জের জনক। এরূপ কথার কোন "প্রমাণ" নাই। কিন্তু বিজ্ঞান লইয়া প্রাচীন ধর্ম্ম সকল গঠিত হয় নাই। যখন বিজ্ঞান হয় নাই, তখন বিজ্ঞান কিছুরই গঠনে লাগিতে পারে না। তবে এই জনকপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাশের কি কোন দাবি দাওয়া ছিল না, তাহা আমাদের বলিবার প্রয়োজন করে না, কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, পৃথিবী জুড়িয়া এই দাবি স্বীকার করিয়াছিল। সকল আদিম ধর্ম্মে আকাশ জনক। অনেক ধর্ম্মে আকাশের নামে ঈশ্বরের নাম।

বেদে দ্যৌঃ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও আকাশ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী। আমরা বলিয়াছি যে, এই "দ্যৌঃ" শব্দই "Zeus," কিন্তু Zeus গ্রীকপুরাণে পৃথিবীর স্বামী নহে। গ্রীকপুরাণে Ouranos দেবের পত্নী Gaia দেবী। Gaia সংস্কৃত "গো"। গো শব্দে পৃথিবী সকলেই জানে। কিন্তু ইহার পতি Zeus **নহেন**, Ouranos পতি। Ouranos দ্যৌঃ **নহেন**-Ouranos বরুণ। বরুণও আকাশ। অতএব গ্রীকপুরাণেও আকাশ পৃথিবীর স্বামী। এবং ইহারাই সেই পুরাণমতে সর্ব্বজীবের জনক- জননী। আমাদের পাঠকেরা, দুই এক জন ছাড়া, বোধ হয় লাটিন ও গ্রীক বুঝেন না-এবং আমরাও দুর্ভাগ্যক্রমে এই অপরাধে অপরাধী। সুতরাং এ কথার পোষকতায় বচন উদ্ধৃতি করিতে পারিলাম না।*

উত্তর আমেরিকার হূরণ, ইরিকোওয়া প্রভৃতি জাতির মধ্যে, আফ্রিকার জুলুজাতি, বন্নিজাতি প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই আকাশ-দেবতা পূজিত। উত্তর আশিয়ার সামোয়েদ জাতির মধ্যে, কিন্ জাতিদিগের মধ্যে এবং চীনজাতিদিগের মধ্যে আকাশ জনক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। অনেক স্থানে আকাশবাচক শব্দই ঈশ্বরবাচক শব্দ।

ঐরূপ আর্য্যজাতীয়দিগের মধ্যে, নানা অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এবং চৈনিক জাতিদিগের মধ্যে আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা, পৃথিবী আকাশের পত্নী; পৃথিবী ও আকাশের সংযোগে বা বিবাহে জীবসৃষ্টি।

চৈনিক দার্শনিকেরা ইহার উপর একটু বাড়াইলেন। আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা ; ইহা হইতে তাঁহারা করিলেন যে, সৃষ্টিতে দুইটি শক্তি আছে-একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী, একটি স্বর্গীয় একটি পার্থিব। একটির নাম ইন্, আর একটির নাম ইয়ঙ্।

ইহাতে পাঠকের, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি পুরুষ মনে পড়িবে। ভারতবর্ষীয়েরা যে চৈনিকদিগের নিকট হইতে এ কথা পাইয়াছিলেন, অথবা চৈনিকেরা যে ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, এমন কথা বলিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, দুই জাতির মধ্যে এক কারণেই এই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছিল। উভয় দেশেই আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা, এবং উভয়ের সংযোগে বিশ্বজনন, এই বিশ্বাস ছিল, তাহা হইতেই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। সাংখ্যের পুরুষ আকাশ নহে, এবং প্রকৃতি পৃথিবী নহে। তাহা আমরা জানি। বোধ হয় এই দ্যাবাপৃথিবীতত্ত্ব, উপনিষদের আত্মতত্ত্ব ও মায়াবাদে মিলিত হইয়া প্রকৃতি পুরুষে পরিণত হইয়া থাকিবে। সেই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব হইতে তান্ত্রিক উপাসনার উৎপত্তি কি না, এবং ভৈরব ও ভৈরবীর মূলে দ্যাবাপৃথিবী কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। এক্ষণে আমরা তাহার বিচারে প্রবৃত্ত নহি।

আমরা এত দিনে যে দুইটি স্থূল কথা বুঝাইলাম, তাহা পাঠককে এইখানে স্মরণ করাইয়া দিই।

প্রথম। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা বিশ্বের নানা বিকাশ মাত্র, যথা-আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি বা বায়ু।

দ্বিতীয়। এইরূপ ইন্দ্রাদির উপাসনা কেবল ভারতবর্ষে নহে, অনেক স্থানে আছে। এক্ষণে আমরা বিচার করিব।

প্রথম। কেন এরূপ ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়। এখানে উপাসনা বস্তুটা কি।

‘প্রচার’, ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৬৩- ৬৭

------

* এই তত্ত্বে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যখন আকাশ ও পৃথিবীর পরিণয় কল্পিত হইয়াছিল, তখন দ্যৌ: শব্দ জিয়স্ শব্দে পরিণত হয় নাই। তখন আর্য্যবংশীয়েরা পৃথক্ পৃথক্ দেশে যাত্রা করে নাই। অনেক কালের প্রাচীন কথা।

চৈতন্যবাদ

পৃথিবীতে ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল?

অনেকেই মনে করেন, এ কথার উত্তর অতি সহজ। খ্রীষ্টীয়ান বলিবেন, মুসা ও যীশু ধর্ম্ম আনিয়াছেন। মুসলমান বলিবেন, মহম্মদ আনিয়াছেন, বৌদ্ধ বলিবেন, তথাগত আনিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও ধর্ম্ম আছে। প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির ধর্ম্মের মুসা মহম্মদ কেহ নাই। পৃথিবীতে কত জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহার সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। সকলেরই এক একটা ধর্ম্ম আছে, এমন কোন জাতি আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাদের কোন প্রকার ধর্ম্মজ্ঞান নাই। এই অসংখ্য জাতিদিগের ধর্ম্মে প্রায় মহম্মদ মুসা খ্রীষ্ট বৌদ্ধের তুল্য কেহ ধর্ম্মস্রষ্টা নাই। তাহাদের ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল?

আর যাহারা বলেন যে, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ, মুসা বা মহম্মদ ধর্ম্ম সৃষ্টি করিযাছেন, তাঁহাদের কথায় একটা ভুল আছে। ইঁহারা কেহই ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই, প্রচলিত ধর্ম্মের উন্নতি করিয়াছেন মাত্র। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে য়িহুদায় য়িহূদী ধর্ম্ম ছিল খ্রীষ্টধর্ম্ম তাহারই উপর গঠিত হইয়াছে ; মহম্মদের পূর্ব্বে আরবে ধর্ম্ম ছিল, ইসলাম তাহার উপর ও য়িহুদী ধর্ম্মের উপর গঠিত হইয়াছে ; শাক্যসিংহের আগে বৈদিক ধর্ম্ম ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সংস্করণ মাত্র। মুসার ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বেও এক য়িহূদী ধর্ম্ম ছিল ; মুসা তাহার উন্নতি করিয়াছিলেন। সেই সকল আদিম ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল-তাহার প্রণেতা কাহাকেও দেখা যায় না। অর্থাৎ কদাচিৎ ধর্ম্মের সংস্কারক দেখা যায়, কোথাও ধর্ম্মের স্রষ্টা দেখা যায় না। সৃষ্ট ধর্ম্ম নাই ; সকল ধর্ম্মই পরম্পরাগত, কদাচিৎ বা সংস্কৃত।

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এমনই একটা প্রশ্ন আছে-পৃথিবীতে জীব কোথা হইতে আসিল? যদি বলা যায়, ঈশ্বরেচ্ছায় বা ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রমে পৃথ্বীতলে জীবসঞ্চার হইয়াছে, তাহা হইলে বিজ্ঞান বিনষ্ট হইল। কেন না, ঈশ্বরেচ্ছায় ঘটিয়াছে ; সকল বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের এই উত্তর দিয়া অনুসন্ধান সমাপন করা যাইতে পারে। অতএব কি জীবোৎপত্তি কি ধর্ম্মোৎপত্তি সম্বন্ধে এ উত্তর দিলে চলিবে না।

কেন না, ধর্ম্মোৎপত্তিও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ইহারও অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক প্রথায় করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রথা এই যে, বিশেষের লক্ষণ দেখিয়া সাধারণ লক্ষণ দেখিয়া সাধারণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হয়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই এই প্রণালী অনুসারে ধর্ম্মের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু নানা মুনির নানা মত। কাহারও মত এমন প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয় না যে, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। আমি নিজে যাহা কিছু বুঝি পাঠকদিগকে অতি সংক্ষেপে তাহার মর্ম্মার্থ বুঝাইতেছি।

ধর্ম্মের উৎপত্তি বুঝিতে গেলে সভ্য জাতির ধর্ম্মের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কিছু পাইব না। কেন না, সভ্য জাতির ধর্ম্ম পুরাতন হইয়াছে, সে সকলের প্রথম অবস্থা আর নাই, প্রথমাবস্থা নহিলে আর কোথাও উৎপত্তি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। গাছ কোথা হইতে হইল, অঙ্কুর দেখিলে বুঝা যায়; প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিয়া বুঝা যায় না। অতএব অসভ্য জাতিদিগের ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া ধর্ম্মের উৎপত্তি বুঝাই ভাল।

এখন, মনুষ্য যতই অসভ্য হৌক না কেন, একটা কথা তাহারা সহজে বুঝিতে পারে। বুঝিতে পারে যে, শরীর হইতে চৈতন্য একটা পৃথক্ সামগ্রী।

এই একজন মানুষ চলিতেছে, খাইতেছে, কথা কহিতেছে, কাজ করিতেছে। সে মরিয়া গেল, আর সে কিছুই পাইল না। তাহার শরীর যেমন ছিল তেমনই আছে, হস্তপদাদি কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু সে আর কিছুই করিতে পারে না। একটা কিছু তার আর নাই, তাই আর পারে না। তাই অসভ্য মনুষ্য বুঝিতে পারে যে, শরীর ছাড়া জীবে আর একটা কি আছে, সেইটার বলে জীবত্ব, শরীরের বলে জীবত্ব নহে।

সভ্য হইলে মনুষ্য ইহার নাম দেয়, "জীবন" বা "প্রাণ" বা আর কিছু। অসভ্য মনুষ্য নাম দিতে পারুক না পারুক, জিনিসটা বুঝিয়া লয়। বুঝিলে দেখিতে পারে যে, এটা কেবল জীবেরই আছে, এমত নহে, গাছ পালারও আছে। গাছ পালাতেও এমন একটা কি আছে যে, সেটা যত দিন থাকে, তত দিন গাছে ফুল ধরে, পাতা গজায়, ফল ধরে, সেটার অভাব হইলেই আর ফুল হয় না, পাতা হয় না, ফল হয় না, গাছ শুকাইয়া যায়, মরিয়া যায়। অতএব গাছ পালারও জীবন আছে। কিন্তু গাছপালার সঙ্গে জীবের একটা প্রভেদ

এই যে, গাছ পালা নড়িয়া বেড়ায় না, খায় না, গলায় শব্দ করে না, মারপিট লড়াই বা ইচ্ছাজনিত কোন ক্রিয়া করে না।

অতএব অসভ্য মনুষ্য জ্ঞানের সোপানে আর এক পদ উঠিল। দেখিল, জীবন ছাড়া জীবে আর একটা কিছু আছে, যাহা গাছপালায় নাই। সভ্য হইলে তাহার নাম দেয়, "চৈতন্য"। অসভ্য নাম দিতে পারুক না পারুক, জিনিষটা বুঝিয়া লয়।

আদিম মনুষ্য দেখে যে, মানুষ মরিলে, তাহার শরীর থাকে-অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণ থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মানুষ নিদ্রা যায়, তখন শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মূর্চ্ছাদি রোগে শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। তখন সে সিদ্ধান্ত করে যে, চৈতন্য শরীর ছাড়া একটা স্বতন্ত্র বস্তু।

এখন অসভ্য হইলেও, মনুষ্যের মনে এমন কথাটা উদয় হওয়ার সম্ভাবনা যে, এই শরীর হইতে চৈতন্য যদি পৃথক্ বস্তু হইল, তবে শরীর না থাকিলে এই চৈতন্য থাকিতে পারে কি না? থাকে কি না?

মনে করিতে পারে, মনে করে, থাকে বৈ কি? স্বপ্নে দেখি ; স্বপ্নে শরীর এক স্থানে রহিল, কিন্তু চৈতন্য গিয়া আর এক স্থানে, দেখিতেছে, বেড়াইতেছে, সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে, নানা কাজ করিতেছে। ভূত আছে, এ কথা স্বীকার আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্তু সভ্য কি অসভ্য মনুষ্য কখন ভূত দেখিয়া থাকে, এ কথা স্বীকার করিবার বোধ হয় কাহারও আপত্তি নাই। মস্তিষ্কের রোগে, ভ্রমবশতঃ মনুষ্যে ভূত দেখে, ইহা বলা যাউক। যে কারণে হউক মনুষ্য ভূত দেখে। মরা মানুষের ভূত দেখিলে অসভ্য মানুষের মনে এমন হইতে পারে যে শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে। এই বিশ্বাসই পরলোকে বিশ্বাস, এইখানেই ধর্ম্মের প্রথম সূত্রপাত।

ইহা বলিয়াছি যে, অসভ্য মনুষ্য বা আদিম মানুষ, যাহাকে ক্রিয়াবান্, আপনার ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্, দেখে, তাহারই চৈতন্য আছে বিশ্বাস করে। জীব, আপন ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্, এজন্য জীবের চৈতন্য আছে, নির্জ্জীব ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ নহে, এজন্য নির্জ্জীব চেতন নহে। কিন্তু আদিম মনুষ্য সকল সময়ে বুঝিতে পারে না, কোন্‌টা চৈতন্যযুক্ত, কোন্‌টা চৈতন্যযুক্ত নহে। পাহাড়, পর্ব্বত, জড়পদার্থ সচরাচর ইচ্ছানুসারে

ক্রিয়াবান্ নহে, সচরাচর ইহাদের অচেতন বলিয়া বুঝিতে পারে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটা পাহাড় অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার সম্পাদন করে। সেটাকে ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ বলিয়া বোধ হয় ; আদিম মনুষ্যের সেটাকে সচৈতন্য বলিয়া বোধ হয়। কলনাদিনী নদী, রাত্রি দিন ছুটিতেছে, শব্দ করিতেছে, বাড়িতেছে, কমিতেছে, কখন ফাঁপিয়া উঠিয়া দুই কূল ভাসাইয়া দিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে, কখন পরিমিত জলসেচ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছে, ইহাকেও ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবতী বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যের কথা বড় আশ্চর্য্য। জগতে ইহাই হোক না কেন, ইনি ঠিক সেই নিয়মিত সময়ে পূর্ব্বদিকে হাজির। আবার ঠিক আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে সমস্ত দিন ফিরিয়া, ঠিক নিয়মিত সময়ে পশ্চিমে লুক্কায়িত। ইহাকেও স্বেচ্ছাক্রিয়া বলিয়া বোধ হয়, ইহাও সচৈতন্য বোধ হয়, চন্দ্র ও তারা সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে পারে। কোথা হইতে আকাশে মেঘ আসে? মেঘ আসিয়া কেন বৃষ্টি করে? বৃষ্টি করিয়া কোথায় চলিয়া যায়? মেঘ আসিলেই বা সকল সময়ে বৃষ্টি হয় না কেন? যে সময়ে বৃষ্টির প্রয়োজন, যে সময়ে বৃষ্টি হইলে শস্য হইবে, সচরাচর ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি হয় কেন? সচরাচর তাহা হয়, কিন্তু এক এক সময়ে তাই বা হয় না কেন? কখন কখন অনাবৃষ্টিতে দেশ জ্বলিয়া যায় কেন? এ সব আকাশের ইচ্ছা, মেঘের ইচ্ছা, বা বৃষ্টির ইচ্ছা, এজন্য আকাশ সচেতন, মেঘ সচেতন, বা বৃষ্টি সচেতন বলিয়া বোধ হয়। ঝড়, বা বায়ু সম্বন্ধেও ঐরূপ। বজ্র বা বিদ্যুৎ সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটে। অগ্নি সম্বন্ধেও যে ঐরূপ ঘটিবে, তাহা অগ্নির ক্রিয়া সকলের সমালোচনা করিলে সহজে বুঝা যাইতে পারে। অগাধ, দুস্তর, তরঙ্গ-সঙ্কুল, জলচরে সংক্ষুদ্ধ রত্নাকর সমুদ্র সম্বন্ধেও সেই কথা হইতে পারে। ইত্যাদি।

এইরূপে জড়ে চৈতন্য আরোপ, ধর্ম্মের দ্বিতীয় সোপান। ইহাকে ধর্ম্ম না বলিয়া, উপধর্ম্ম বলিতে কেহ ইচ্ছা করেন, আপত্তি নাই। ইহা স্মরণ রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে, উপধর্ম্মই সত্য ধর্ম্মের প্রাথমিক অবস্থা। বিজ্ঞানের প্রথমাবস্থা যেমন ভ্রমজ্ঞান, ইতিহাসের প্রথমাবস্থা যেমন লৌকিক উপন্যাস বা উপকথা, ধর্ম্মের প্রথমাবস্থা তেমনি উপধর্ম্ম। মতান্তর আছে, তাহা আমরা জানি, কিন্তু মনুষ্যের আদিম অবস্থায় বিজ্ঞান নিকৃষ্ট, ইতিহাস

নিকৃষ্ট, দর্শন কাব্য সাহিত্য-শিল্প, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা বুদ্ধি, সবই নিকৃষ্ট, কেবল তত্ত্বজ্ঞান উৎকৃষ্ট হইবে ইহা সম্ভব নহে।

তার পর ধর্ম্মের তৃতীয় সোপান। যে সকল জড়পদার্থে মনুষ্য চৈতন্যারোপ করিতে আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতিশয় ক্ষমতাশালী, তেজস্বী, বা সুন্দর। সেই আগ্নেয়গিরি একেবারে দেশ উৎসন্ন দিতে পারে, তাহার ক্রিয়া দেখিয়া মনুষ্যবুদ্ধি স্তম্ভিত, লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। সেই কূলপরিপ্লাবিনী, ভূমির উৎপাদিকা শক্তির সঞ্চারিণী নদী, মঙ্গলে অতিশয় প্রশংসনীয়া, অমঙ্গলে অতি ভয়ঙ্করী বলিয়া বোধ হয়। ঝড়, বৃষ্টি, বায়ু, বজ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, ইহাদের অপেক্ষা আর বলবান্ কে? ইহাদের অপেক্ষা ভীমকর্ম্মা কে? যদি ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ থাকে, তবে সূর্য্য ; ইঁহার প্রচণ্ড তেজ, আশ্চর্য্য গতি, ফলোৎপাদন জীবোৎপাদন শক্তি, আলোক, সকলই বিস্ময়কর। ইঁহাকে জগতের রক্ষক বলিয়া বোধ হয়, ইনি যতক্ষণ অনুদিত থাকেন, ততক্ষণ জগতের ক্রিয়াকলাপ প্রায় বন্ধ হইয়া থাকে।

এই সকল শক্তিশালী মহামহিমাময় জড় পদার্থ, যদি সচেতন স্বেচ্ছাচারী বলিয়া বোধ হইল, তবে মানুষের মন ভয়ে বা প্রীতিতে অভিভূত হয়। ইহাদের কেবল শক্তি এত বেশী তাই নহে, মনুষ্যের মঙ্গলামঙ্গল ইহাদিগের অধীন। সচরাচর দেখা যায় যে, যে চৈতন্যযুক্ত, সে তুষ্ট হইলে ভাল করে, রুষ্ট হইলে অনিষ্ট করে। এই সকল মহাশক্তিযুক্ত মঙ্গলামঙ্গল-সম্পাদক পদার্থ যদি চৈতন্যবিশিষ্ট হয়, তবে তাহারাও সেই নিয়মের বশীভূত, ইহা আদিম মনুষ্য মনে করে। মনে করে, তাহাদের তুষ্ট রাখিতে পারিলে সর্ব্বত্র মঙ্গল, তাহারা রুষ্ট হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। র্ব্বইহাতে উপাসনার উৎপত্তি। ইহাই ধর্ম্মের তৃতীয় সোপান। এই জন্য সর্ব্বদেশে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ঝড়, বৃষ্টি, অগ্নি, জলধি, আকাশাদির উপাসনা। এই জন্য বেদের ইন্দ্রাদি আকাশ দেবতা, সূর্য্য দেবতা, অগ্নি দেবতা প্রভৃতির উপাসনা।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। উপাসনা দ্বিবিধ। যাহার শক্তিতে ভীত হই, বা যাহার শক্তি হইতে সুফল পাইবার আশা করি, তাহার উপাসনা করি। কিন্তু তা ছাড়া আরও এমন সামগ্রী আছে, যাহার উপাসনা করি, সেবা করি, আদর করি। যাহার

ভয়দায়িতা শক্তি নাই, অথচ হিতকর তাহারও আদর করি। অচেতন ওষধি বা ঔষধের আমরা এরূপ আদর করি। ছায়াকারক বট বা স্বাস্থ্যদায়ক শেফালিকা বা তুলসীর তলায় জল সিঞ্চন করি। উপকারী অশ্বের ইত্যবৎ সেবা করি। গৃহরক্ষক কুক্কুরকে যত্ন করি। দুগ্ধদায়িনী গাভী, এবং কর্ষণকারী বলদকে আরও আদর করি। ধার্ম্মিক মনুষ্যকে ভক্তি করি। এ এক জাতীয় উপাসনা। এই উপাসনার বশবর্ত্তি হইয়া হিন্দু ছুতার কুড়ালি পূজা করে, কামার হাতুড়ি পূজা করে। বেশ্যা বাদ্যযন্ত্র পূজা করে, লেখক লেখনী পূজা করে, ব্রাহ্মণ পুঁথি পূজা করে।*

আরও আছে। যাহা সুন্দর, তাহা আমরা বড় ভালবাসি। সুন্দর হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কোন উপকার পাই না, তবু আমরা সুন্দরের আদর করি। যে ছেলে চন্দ্র হইতে কি উপকার বা অপকার পাওয়া যায়, তাহার কিছুই জানে না, সেও চাঁদ ভালবাসে। যে ছবির পুতুল, আমাদিগের ভাল মন্দ কিছুই করিতে পারে না, তাহাকেও আদর করি। সুন্দর ফুলটি, সুন্দর পাখিটি, সুন্দর মেয়েটিকে বড় আদর করি। চন্দ্র কেবল সৌন্দর্য্য গুণেই দেবতা, সাতাইশ নক্ষত্র তাহার মহিষী।

প্রকৃত পক্ষে ইহা উপাসনা নহে, কেবল আদর। কিন্তু অনেক সময় ইহা উপাসনা বলিয় গণিত হয়। বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাই অনেক সময়ে হইয়াছে। কথাটা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় অনুবাদ করা যাউক তাহা হইলেই অনেকেই বুঝিতে পারিবেন।

যাহা শক্তিশালী, তাহা নৈসর্গিক পদার্থের কোন বিশেষ সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলিয়াই শক্তিশালী। কার্ব্বনের প্রতি অম্লজানের নৈসর্গিক অনুরাগই অগ্নির শক্তির কারণ। তাপ, জল, ও বায়ু এই তিন পদার্থের পরস্পরে বিশেষ কোন সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়াতেই মেঘের শক্তি।

এই যে জাগতিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের কথা বলিলাম, এই সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক নাম সত্য। সত্যই শক্তি। কেবল জড়শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। যীশু বা শাক্যসিংহের উক্তি সকল বা কর্ম্ম সকল সমাজের সহিত নৈসর্গিক শক্তিবিশিষ্ট, অর্দ্ধেক জগৎ আজিও তাঁহাদের বশীভূত।

যাহা হিতকর, শক্তিশালী হউক বা না হউক, কেবল হিতকর, ঊনবিংশ শতাব্দী তাহার নাম দিয়াছে, শিব! সুন্দর বা সৌম্যের নূতন নাম কিছু হয় নাই, সুন্দর সুন্দরই আছে, সৌম্য সৌম্যই আছে।

এই সত্য (The True), শিব (The Good) এবং সুন্দর (The Beautiful) এই ত্রিবিধ ভাব মানুষের উপাস্য। এই উপাসনা দ্বিবিধ হইতে পারে। উপাসনার সময়ে অচেতন উপাস্যকে সচেতন মনে করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে, আদিম মনুষ্য তাহাই করিয়া থাকে। এই উপাসনা-পদ্ধতি ভ্রান্ত, কাজেই অহিতকর। দ্বিতীয়বিধ উপাসনায়, অচেতনকে অচেতন বলিয়া জ্ঞান থাকে। গেটে (Goethe) বা বর্ডস্বর্থ (Wordsworth) এই জাতীয় জড়োপাসক। ইহা অহিতকর নহে, বরং হিতকর, কেন না, ইহার দ্বারা কতকগুলি চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি সাধিত হয়। ইহা অনুশীলন বিশেষ। এখনকার দেশী পণ্ডিতেরা (বিশেষ বালকেরা) তাহা বুঝিতে পারিয়া উঠে না, কিন্তু কতকগুলি বৈদিক ঋষি তাহা বুঝিতেন। বেদে দ্বিবিধ উপাসনাই আছে।

‘প্রচারে’র প্রথম সংখ্যা হইতে বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা কি কি বলিলাম তাহা একবার স্মরণ করিয়া যাউক।

১। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা, আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড়ের বিকাশ ভিন্ন লোকাতীত চৈতন্য নহেন।

২। এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, এবং ভারতবর্ষীয়েরা যেমন ইঁহাদিগের দেবতা বলিয়া মানিয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণ করিত বা করে।

৩। ইহার কারণ এই যে, প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ করিয়া, তাহার শক্তি হিতকারিতা, বা সৌন্দর্য্য অনুসারে, তাহার উপাসনা করে।

৪। সেই উপাসনা ইষ্টকারী এবং অনিষ্টকারী উভয়বিধ হইতে পারে। এখন দেখিতে হইবে, বেদে কিরূপ উপাসনা আছে। তাহা হইলেই আমরা বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করি।-‘প্রচার’, ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৭৪-৮৩।

——————

* এই কথা শুনিয়া সর আলফ্রেড লায়েল লিখিলেন, কি ভয়ানক উপধর্ম্ম! এমন নিকৃষ্ট জাতির কি গতি হইবে। কাজেই বুদ্ধির জোরে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর হইলেন।

উপাসনা

পূর্ব্বে উপাসনা সম্বন্ধে যাহা বলা গিয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, উপাসনা দ্বিবিধ। এক, যাহাদের ফলপ্রদ বিবেচনা করা যায়, তাহাদের কাছে ফলকামনাপূর্ব্বক তাহাদের উপাসনা, আর, এক যাহাকে ভালবাসি, বা যাহার নিকট কৃতজ্ঞ হই, তাহার প্রশংসা বা আদর। প্রথমোক্ত উপাসনা সকাম, দ্বিতীয় নিষ্কাম। এইরূপ সামান্য নিষ্কাম উপাসনা কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে হইতে পারে এমত নহে, সামান্য জড়পদার্থ সম্বন্ধে হইতে পারে। ভিন্নজাতীয় মহাত্মাদিগের বিশ্বাস যে, হিন্দু গোরুর উপাসনা করে। বস্তুতঃ এমন হিন্দু কেহই নাই যে, বিশ্বাস করে যে, আমি আমার গাইটির স্তবস্তুতি বা পূজা করিলে সে আমাকে কোন ফল দিবে। গোরু ঘাস খায়, আর দুধ দেয়, তাহা ছাড়া আর কিছু পারে না, তাহা সকলেই জানে। তবে সাধারণ হিন্দুর এই বিশ্বাস যে গোরুকে যত্ন করিলে, আদর করিলে, দেবতা প্রসন্ন হয়েন। এ কথাটা তত অসঙ্গত নহে। যাহা উপকারী, তাহা আদরের। যাহা আদরের, তাহার আদর অনুষ্ঠেয় কার্য্য ঈশ্বরানুমোদিত। এইরূপ গোরুর আদরের একটা উদাহরণের বেদ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতায় দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে বৎসাপাকরণ কার্য্যের মন্ত্রে আছে,

"হে বৎসগণ, তোমরা ক্রীড়াপরবশ, সুতরাং বায়ুবেগে দিগ্দিগন্তরে ধাবমান হও। বায়ুদেবতাই তোমাদিগের রক্ষক। ৩ ||

হে গাভীগণ, আমরা শ্রেষ্ঠতম কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। তৎসাধনার্থ সবিতা-দেবতা তোমাদিগকে প্রভূত তৃণ বন প্রাপ্ত করান। ৪ ||

হে (স্বল্প বা বহুতর) রোগশূন্য অচিরপ্রসূতা অবধ্য গাভীগণ! তোমরা অক্ষুব্ধ চিত্তে নিঃশঙ্ক ভাবে গোষ্ঠে প্রচুর তৃণ শস্য ভোজন করতঃ ইন্দ্র দেবতার ভোগের উপযোগী দুগ্ধের পরিবর্দ্ধন কর। তোমাদিগকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বা চৌর প্রভৃতি পাপিগণ কেহই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে না। তোমরা এই যজমানের গৃহে চিরদিন বহুপরিবার হইতে থাক। ৫ || 1

ঐ যজ্ঞের দুগ্ধকে সম্বোধন করিয়া ঋত্বিক্‌ বলেন,

“হে দুগ্ধ, যজ্ঞীয় সুপবিত্র শতধার এই পবিত্রে তুমি শোধিত হও। সবিতা-দেবতা তোমাকে পবিত্র করুন।”

উখা অর্থাৎ হাঁড়িকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়। “হে উখে! তুমি মৃন্ময়, সুতরাং পৃথিবীরূপিণী ত বটেই। অধিকন্তু তোমার সাহায্যে যজমানগণের দ্যুলোক প্রাপ্তি হয়। অতএব দ্যুরূপাও তোমাকে বলিতে পারি। ২ ||

“হে উখে, তোমার উদরে অবকাশ আছে। সুতরাং বায়ুর স্থান অন্তরীক্ষলোকও তোমার অধীন। অতএব তোমাকে অন্তরীক্ষলোকও বলিতে পারি। এতাবতা তুমি ত্রিলোকস্বরূপ। সমস্ত দুগ্ধ ধারণেই সক্ষম হইতেছ। স্বীয় উৎকৃষ্ট তেজে দৃঢ় থাকিবে। বক্র হইবে না। সাবধান! তোমার দার্ঢ্যের ন্যূনতা বা বক্রতা হইলেই যজ্ঞবিঘ্ন হইবে। সুতরাং যজমান আমাদিগের প্রতি বক্র হইতে পারেন, অতএব তিনি যাহাতে বক্র না হন। ৩ || ”

এখানে সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, যাহার উপাসনা হইতেছে, উপাসক তাহাকে অচেতন জড়পদার্থ বলিয়া জানেন। হাঁড়ি কি দুধকে কেহই ইষ্টানিষ্টফলপ্রদানে সক্ষম চৈতন্যবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারে না। অথচ তাহার উপাসনা হইতেছে। এ উপাসনা কেবল আদর মাত্র। গোবৎস সম্বন্ধেও ঐরূপ। অন্য যজ্ঞের মন্ত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

চাতুর্ম্মাস্য যাগে দর্ব্বী অর্থাৎ হাতাকে বলা হইতেছে,

“হে দর্ব্বি, তুমি অন্নে পরিপূর্ণ হইবার অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছ। এই আকারেই ইন্দ্র দেবতার সমীপে গমন কর। ভরসা করি পুনরাগমনকালেও ফলে পরিপূর্ণ হইয়া এইরূপ শোভিত হইবে।”

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে প্রথমেই যজমানের মস্তক কেশ ও শ্মশ্রু প্রভৃতি ক্ষুরের দ্বারা মুণ্ডন করিতে হয়। আগে কুশা কাটিয়া ক্ষুর পরীক্ষা করিতে হয়। সেই সময় কুশাকে বলিতে হয়, “হে কুশা সকল! অতীক্ষ্ণধার ক্ষুরের দ্বারা ক্ষৌরে যে কষ্ট হইতে পারে তাহা হইতে ত্রাণ কর। অর্থাৎ তোমাদের দ্বারাই তাহা পরীক্ষিত হউক।”

পরে ক্ষৌরকালে ক্ষুরকে বলিতে হয়, “হে ক্ষুর, তুমি যেন ইঁহার রক্তপাত করিও না।”

পরে স্নান করিয়া ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। বস্ত্র পরিধানকালে বস্ত্রকে বলিতে হয়, “হে ক্ষৌম! তুমি কি দক্ষিণীয় কি উপসদ উভয় প্রকার যজ্ঞেরই অঙ্গীভূত হইতেছ। আমি এই স্নানে সুন্দর কান্তি লাভ করতঃ সুখস্পর্শ কল্যাণকর তোমাকে পরিধান করিতেছি।”

তার পর গাত্রে নবনীত মর্দ্দন করিতে হয়। মর্দ্দনকালে নবনীতকে বলিতে হয়, “হে গব্য নবনীত! তুমি তেজ সম্পাদনে সমর্থ হইতেছ। আমাকে তেজঃপ্রদান কর।”

এ সকল স্থানে কি কুশা কিংবা ক্ষুর বা বস্ত্র বা নবনীতকে কেহ ফলপ্রদানে সক্ষম চৈতন্যবিশিষ্ট দেবতা মনে করিতেছে না। বাতুল ভিন্ন অপরের দ্বারা এরূপ বিবেচনা হওয়া সম্ভব নহে। এ সকল কেবল যত্নের বস্তুতে যত্নজনক বিধি প্রয়োগ মাত্র। ইন্দ্রাদি দেবের যে স্তুতি সকল ঋগ্বেদে আছে আদৌ তাহা প্রশংসনীয় বা আদরণীয়ের প্রশংসা বা আদর মাত্র ছিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটি ইন্দ্রসূক্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

“ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্ব্বতানাং ||
অহন্নহিং পর্ব্বতে শিশ্রিয়াণাং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্য্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধনবঃ স্যন্দমানা অংজঃ সমুদ্রবজগ্মুরাপঃ ||
বৃষায়মনোহবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্য।
আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাং ||
যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনামাণ্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ।
আৎ সূর্য্যং জনয়ন্ দ্যামুষাসং তাদিত্না শত্রুং ন কিলাবিবিৎসে ||
অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কন্ধাংসীব কুলিশেনাবিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ ||
অযোদ্ধেব দুর্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধামৃজীষম্।
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সংরুজানাঃ পিপিষ ইন্দ্রশত্রুঃ ||

অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধি সানৌ জঘান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বভূষন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়ৎ ব্যস্তঃ ||
নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনো রুহাণা অতিযন্ত্যাপঃ।
যাশ্চিৎ বৃত্রো মহিনা পর্য্যতিষ্ঠৎ তাসামহিঃ পৎসুতঃশীর্বভুব ||
নীচাবয়া অভবৎ বৃত্রপুত্রেন্দ্রা অস্যা অব বধর্জভার।
উত্তরা সূরধরঃ পুত্র আসীৎ দানুঃশয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ ||
অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং।
বৃত্রস্য নিণ্যং বিচরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশত্রুঃ ||
দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।
অপাং বিলমপিহিতং যদাসীৎ বৃত্রং জঘন্বাঁ অপ তদ্ববার ||
অশ্ব্যো বারো অভবস্তদিন্দ্র সৃকে যত্ত্বা প্রত্যহন্দেব একঃ।
অজয়ো গা অজয়ঃ শূর সোমমবাসৃজঃ সর্ত্তবে সপ্ত সিন্ধুন্ ||
নাস্মৈ বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ ন যাং মিহমকিরৎব্রাদুনিং চ।
ইন্দ্রশ্চ যৎযুযুধাতে অহিশ্চোতাপরীভ্যো মঘবা বিজিগ্যে ||
অহের্ষাতারং কমপশ্য ইন্দ্র হৃদি যত্তে জঘ্নুষো ভীরগচ্ছৎ।
নব চ যন্নবতিং চ স্রবন্তীঃ শ্যোনো ভীতো অতরো রজাংসি ||
ইন্দ্রো যাতোহবসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃঙ্গিনো বজ্রবাহুঃ।
সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান্ন নেমিঃ পরি তা বভূত || ”

অনুবাদ

১। “বজ্রধর ইন্দ্রদেব প্রথমে যে সমস্ত পরাক্রমসূচক কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা আমি বর্ণনা করিতেছি। তিনি অহিনামে অভিহিত বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। জলসমূহ ভূমিতে পতিত করিয়াছিলেন। এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের রুদ্ধ বহনশীল নদী সকলের কূল ভগ্ন করিয়া জল প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

২। ইন্দ্রদেব পর্ব্বতে লুক্কায়িত বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। ত্বষ্টৃদেব ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত গর্জ্জনশীল বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বৃত্রাসুর হত হইলে পর রুদ্ধগতি নদী

সকল বেগের সহিত সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, যদ্রূপ গো সকল হম্বারব করিয়া সত্বর বৎসরে নিকট গমন করে।

৩। বলবান্ ইন্দ্রদেব সোমরস পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং উপর্য্যুপরি যজ্ঞত্রয়ে সোমরস পান করিয়াছিলেন। তৎপরে বলবান্ ইন্দ্রদেব মারকবজ্র গ্রহণপূর্ব্বক অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। ৪। হে ইন্দ্রদেব! আপনি যখন অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া মায়াবী অসুরদিগের মায়া নষ্ট করিয়াছিলেন এবং তৎপরে যখন সূর্য্য ঊষাকাল এবং আকাশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন আর কোন শত্রু দেখিতে পান নাই।

৫। ইন্দ্রদেব তাঁহার বৃহৎ ও বধকারী বজ্রের সহিত লোকের উপদ্রবকারী বৃত্রাসুরকে লোকে যেমন কুঠার দ্বারা বৃক্ষস্কন্ধ ছেদন করে, তদ্রূপ বাহুচ্ছেদনপূর্ব্বক বধ করিয়াছিলেন, এবং বৃত্রাসুরকে তদবস্থ ভূমির উপর পাতিত করিয়াছিলেন।

৬। আমার সমান যোদ্ধা আর কেহ নাই এইরূপ দর্পযুক্ত বৃত্রাসুর মহাবীর ও বহুশত্রুনিবারক ইন্দ্রদেবকে যুদ্ধার্থে স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রদেবের অস্ত্রপ্রহার হইতে কোন প্রকারে আপনাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে হত হইয়া নদী সকলের উপর পতিত হইয়া তাহাদের কূলাদি ভগ্ন করিয়াছিলেন।

৭। হস্ত ও পদশূন্য হইয়াও বৃত্রাসুর ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং ইন্দ্র ইহার পাষাণসদৃশ স্কন্ধের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। পৌরুষবর্জ্জিত ব্যক্তি যদ্রূপ পৌরুষবিশিষ্ট ব্যক্তির সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ বৃত্রাসুর ইন্দ্রের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা ইন্দ্র কর্ত্তৃক শরীরের নানা স্থানে আহত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিল।

৮। নদীর জল সকল ভগ্ন কূলের উপর যেমন বেগের সহিত প্রবাহিত হয় তদ্রূপ নদীর উপর পতিত বৃত্রাসুরের দেহের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল। বৃত্রাসুর জীবনদশায় যে জল সকল বলের দ্বারায় রুদ্ধ রাখিয়াছিল সেই জল সকলের নিম্নে মৃত্যুর পর তাহার দেহ পতিত রহিল।

৯। বৃত্রাসুরের মাতা পুত্রদেহ রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং বৃত্রকে ব্যবহিত করিয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্রদেব বৃত্রের মাতার উপর বজ্র প্রহার করেন, তাহাতে বৃত্রমাতা হত হইয়া গাভী

বৎসের সহিত যেমন শয়ন করে, তদ্রূপ মৃত পুত্রের উপর পতিত হইয়া তাহা আচ্ছাদিত করতঃ শয়ন করিয়াছিল।

১০। অবিশ্রান্ত প্রবহনশীল নদী সকলের জলমধ্যে বৃত্রাসুরের দেহ পতিত হইল। জল সমূহ বন্ধনমুক্ত হইয়া অন্তর্হিত বৃত্রদেহের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রদেবের সহিত শত্রুতা করিয়া বৃত্রাসুর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

১১। দাস এবং অহিনামে প্রসিদ্ধ বৃত্রাসুর যে সকল নদীর প্রবাহ নিরোধ করিয়াছিল যদ্রূপ পণি নামক অসুর গো সকল গুহাতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া সেই সকল নিরোধ দূর করিয়া প্রবাহমার্গ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

১২। হে ইন্দ্রদেব! যখন অসহায় বৃত্রাসুর আপনার বজ্রে প্রতিপ্রহার করিয়াছিল তখন আপনি অনায়াসে বৃত্রাসুরকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন, যদ্রূপ অশ্বপুচ্ছগত বালসমূহ মক্ষিকাদি অনায়াসে নিরাকৃত করে। তদন্তর আপনি পণি নামক অসুর কর্ত্তৃক অপহৃত অনিরুদ্ধ ও নিরুদ্ধ গোসমূহ জয় করিয়া স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। জয়লাভ করিয়া সোমরস পান করিয়াছিলেন এবং সপ্তনদীর প্রবাহ নিরোধ অপনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

১৩। বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত যে বিদ্যুৎ প্রহার, যে গর্জ্জন, যে বর্ষণ, যে অশনি নিক্ষেপ, এবং যে অপরাপর কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই ইন্দ্রের অনিষ্ট করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল এবং অবশেষে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে অভিভূত করিয়াছিলেন।

১৪। হে ইন্দ্রদেব! আপনি যখন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এবং ভীত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় একোনশত সংখ্যক প্রবহনশীল নদী পার হইয়াছিলেন, তখন বৃত্রাসুর বধের নির্য্যাতনেচ্ছু কোন্ জনকে দেখিয়াছিলেন।

১৫। বজ্রধর ইন্দ্রদেব স্থাবর এবং জঙ্গম জগতের রাজা, শান্ত এবং দুর্দান্ত জীবগণের অধীশ্বর। এবম্ভূত ইন্দ্রদেব মনুষ্যদিগের প্রভু। রথচক্রের নেমি যদ্রূপ চক্রগত অরাখ্য কাষ্ঠ সকল বেষ্টন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি মনুষ্যদিগকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টনপূর্ব্বক রক্ষা করেন।”2

এই সূক্তের তাৎপর্য্য বড় স্পষ্ট। পূর্ব্বে বুঝান গিয়াছে, ইন্দ্র বর্ষণকারী আকাশ। বৃত্র বৃষ্টিনিরোধকারী নৈসর্গিক ব্যাপার। বর্ষণশক্তির দ্বারা সেই সকল নৈসর্গিক ব্যাপার অপহৃত হইলে বৃত্রবধ হইল। এই সূক্ত বর্ষণকারী আকাশের সেই ক্রিয়ার প্রশংসা মাত্র। ইন্দ্র এখানে কোন চেতনাবিশিষ্ট পুরুষ নহেন, এবং এ সূক্তে তাহার কোন সকাম উপাসনাও নাই।

স্বীকার করি, এক্ষণে বৈদিক সংহিতায় যে উপাসনা আছে, তাহার প্রায় অধিকাংশই সকাম, এবং উপাস্যেরা তাহাতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু জড়শক্তির প্রশংসা-পদ্ধতি ক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিলে, শব্দের আড়ম্বরে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য লোকের চিত্ত হইতে অপসৃত হইল। "জগতের রাজা," এবং "জীবগণের অধীশ্বর" ইত্যাকার বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য যে, বৃষ্টি হইতেই জগৎ ও জীবের রক্ষা, লোকে ইহা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এবং ইন্দ্রকে যথার্থ জগতের চৈতন্যবিশিষ্ট রাজা এবং জীবগণের চৈতন্যবিশিষ্ট অধীশ্বর মনে করিতে লাগিল। তখন জগতের জড়শক্তির নিষ্কাম প্রশংসার স্থানে সকাম উপাসনা আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন মাত্র ছিল, তাহা দেবতাবহুল উপধর্ম্মে পরিণত হইল।

বৈদিক ধর্ম্মের উৎপত্তি কি তাহা উপরি উদ্ধৃত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সূক্তগুলি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। ঋগ্বেদ-সংহিতার সকল সূক্তগুলি এক সময়ে প্রণীত হয় নাই ; এবং ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র বহু দেবতার উপসানাত্মক উপধর্ম্মই যে আছে, এমত নহে। অনেকগুলি এমত সূক্ত আছে যে, তাহা হইতে আমরা একেশ্বরবাদই শিক্ষা করি। সময়ান্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব। সেইগুলি যে বৈদিক ধর্ম্মের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায়, আর উপরি উদ্ধৃত সূক্তের সদৃশ সূক্তগুলি যে আদিম অবস্থায় আর সচেতন ইন্দ্রাদির উপাসনাত্মক সূক্তগুলি প্রধানতঃ যে মধ্যাবস্থায় প্রণীত হইয়াছিল, ইহা যে মনোযোগপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিবে সেই বুঝিতে পারিবে। বেদব্যাস, বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। সঙ্কলন ব্যতীত চতুর্ব্বেদের বিভাগ হয় নাই। যাহা সঙ্কলিত, তাহা নানা ব্যক্তির দ্বারা নানা সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। অতএব, আদিম, মধ্যকালিক, এবং শেষাবস্থার সূক্ত বলিয়া সূক্তগুলিকে বিভাগ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মের প্রথমাবস্থা জড়

প্রশংসা, মধ্যকালে চৈতন্যবাদ, এবং পরিণতি একেশ্বরবাদে। অতএব সূক্তের তাৎপর্য্য বুঝিয়া তাহার সময় নির্দ্দেশ করা যায়।

এক্ষণে ‘প্রচারে’র দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে এ পর্য্যন্ত বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিলাম পাঠক তাহা স্মরণ করুন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্যে এই;-

১। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা, আকাশ, সূর্য্যে, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড়ের বিকাশ ভিন্ন কোন লোকোত্তর চৈতন্য নহে।

২। এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য দেশে ছিল বা আছে।

৩। তাহার কারণ এই যে, প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ করিয়া তাহার শক্তি, হিতকারিতা, বা সৌন্দর্য্য অনুসারে তাহার উপাসনা করে।

৪। এই উপাসনা গোড়ায় কেবল শক্তিমান, সুন্দর বা উপকারী জড়পদার্থের প্রশংসা বা আদর মাত্র। কালে লোকে সে কথা ভুলিয়া গেলে, ইহা ইতর দেবতার উপাসনায় পরিণত হয়।

হিন্দুধর্ম্মে ইতর দেবোপসনা এই অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ঈদৃশ উপাসনা অনিষ্টকর এবং উপধর্ম্ম। কিন্তু ইহার মূল অনিষ্টকর নহে। জড়শক্তিও ঈশ্বরের শক্তি। সে সকলের আলোচনার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা এবং কৃপা অনুভূত করা এবং তদ্দ্বারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন করা বিধেয় বটে।

বৈদিক ধর্ম্মের এই স্থূল তাৎপর্য্য। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মেও সেই সকল বৈদিক দেবতারা উপাসিত। অতএব এখনকার হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারে সেই কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। জড়ের শক্তির চিন্তার দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনী এবং চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন করিব, এবং ঈশ্বরের মহিমা বুঝিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু জড়ের উপাসনা করিব না। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের একটি স্থূল কথা।

এক্ষণে বৈদিক তত্ত্বান্তর্গত দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করিয়া, আমরা বৈদিক তত্ত্বান্তর্গত ঈশ্বরতত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। হিন্দুধর্ম্মের এই ব্যাখ্যার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করিলাম।-‘প্রচার’, ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৯৭-৪০৭।

------

1 এই প্রবন্ধে যজুর্মন্ত্রের যে যে অনুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমীকৃত বাজসনেয়ী সংহিতার অনুবাদ হইতে।

2 এই অনুবাদ ৺রমানাথ সরস্বতী কৃত।

হিন্দু কি জড়োপাসক?

যতক্ষণ আমার অঙ্গুলিটি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে ততক্ষণ ঐ অঙ্গুলিটি চেতনাময়, কিন্তু অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিলে, উহা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, উহাতে আর চেতনা থাকে না, তখন উহা অচেতন জড় পদার্থ।

এই সমগ্র বিশ্ব চৈতন্যময় এক পুরুষের দেহ। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তির আধার সকল, অর্থাৎ অগ্নি বায়ু ইত্যাদি সকল সেই দেবতার অঙ্গবিশেষ। অগ্নিকে যদি সেই এক চৈতনময় পুরুষের অঙ্গ বলিয়া জানি, অগ্নিকে যদি সেই চৈতন্যময় পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখি, তবে অগ্নির চেতনা আছে বলিয়া বুঝিব। আর যিনি অগ্নির সহিত সেই চৈতন্যময়ের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না তাঁহার কাছেই অগ্নি জড় পদার্থ।

আজকালকার পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অগ্নিকে (Igneous principle) জড় বলিয়া জানেন কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণ অগ্নির সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ বুঝিয়া উহাকে চেতন বলিয়া বুঝিতেন। আজকালকার পাশ্চাত্ত্যগণ অগ্নিগত শক্তিকেই (Heat) জগতের আদি শক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু ঋষিগণও এই অগ্নিকে জগতের আদি শক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তবে প্রভেদ এই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের অগ্নি জড়শক্তি, প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের অগ্নি চেতনাযুক্ত।

প্রণব মন্ত্র হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য চলিতেছে। এই প্রণব মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। হিন্দুরা বুঝিয়াছিলেন যে, এই অগ্নিগত শক্তি হইতেই এই জগৎচক্র ঘুরিতেছে। কিন্তু এই অগ্নিগত শক্তি যে চৈতন্য সম্বন্ধ রহিত ইহা তাঁহারা কখনও ভাবিতেন না। হিন্দুদের কাছে প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি ব্রহ্মচৈতন্যে চেতনাযুক্ত।

ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দ্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি সম্বন্ধে যিনি চিন্তা করিতে চান, অথবা উক্ত শক্তির সাহায্যে যিনি কোন কর্ম্ম করিতে চান, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে উক্ত মন্ত্রের ঋষি কে-তাহা জানিতে হইবে। মন্ত্রের ঋষি কে-ইহা না জানিয়া অর্থাৎ মন্ত্রের লক্ষ্যশক্তি কিরূপ

চেতনাযুক্ত ইহা না জানিয়া যিনি মন্ত্র সাহায্য গ্রহণ করেন তাঁহাকে পাপভাক্ হইতে হয়, ইহা শ্রুতির কথা।

যোঽহরহরবিদিতঋষিচ্ছন্দো দৈবতাবিনিয়োগেন ব্রাহ্মণেন বা মন্ত্রেণ বা যজাতি যাজয়তি বা অধীতে অধ্যাপয়তি বা হোমে কর্ম্মাণি অন্তর্জলাদৌ বা স পাপীয়ান্ ভবতি।

এখন দেখ বেদোক্ত ধর্ম্মাচারী ঋষিগণকে জড়োপাসক বলা কি কোন ক্রমে সঙ্গত হয়? যে পাশ্চাত্ত্যগণ হিন্দুদের জড়োপাসক বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই জড়োপাসক। পাশ্চাত্ত্যগণ আজকাল নানা প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য অবলম্বন করিয়া নানাবিধ কর্ম্মা প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু ঐ সকল শক্তি যে চৈতন্যময়ের চেতনাযুক্ত, ইহা একবারও ভাবেন না। জগতে ঐ সকল শক্তি দ্বারা চৈতন্যময়ের কি প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে পাশ্চাত্ত্যগণ তাহা একবার অনুসন্ধান করেন না। পাশ্চাত্ত্যগণ ঋষি বিনিয়োগাদি না জানিয়া প্রাকৃতিক শক্তির সহিত খেলা করিতেছেন। শ্রুতি মতে উঁহারা পাপভাগী হইতেছেন।

আমার বোধ হয় যেদিন হইতে ডাইনামাইট সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিন হইতে পাশ্চাত্ত্যগণের উক্ত পাপের ফল ফলিবার সূত্রপাত হইয়াছে।

হিন্দুরা জড়োপাসক নহে। চেতনাবিহীন পদার্থ হিন্দুদের কাছে অস্পৃশ্য পদার্থ। আজকাল যাহাকে জড় পদার্থ বলা হয়, যেমন অগ্নি বায়ু নদী পর্ব্বত ইত্যাদি, ইহারা হিন্দুদের কাছে চৈতন্যময়ের চেতনাযুক্ত পদার্থ। চেতনাবিহীন পদার্থ আর মৃত শরীর এই দুইটি কথায় হিন্দু একই অর্থ বুঝিয়া থাকেন। মৃত শরীরের সংস্পর্শে হিন্দু থাকিতে চান না।-'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ৪২৭- ৩০।

হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা

আমরা বেদের দেবতাতত্ত্ব সমাপন করিয়াছি। এক্ষণে ঈশ্বরতত্ত্ব সমালোচনে প্রবৃত্ত হইব। পরে আনন্দময়ী ব্রহ্ম কথায় আমরা প্রবেশ করিব।

একজন ঈশ্বর যে এই জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন, এবং ইহার স্থিতিবিধান ও ধ্বংস করিতেছেন, এই কথাটা আমরা নিত্য শুনি বলিয়া ইহা যে কত গুরুতর কথা, মনুষ্যবুদ্ধির কত দূর দুষ্প্রাপ্য, তাহা আমরা অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারি না। মনুষ্যজ্ঞানের অগম্য যত তত্ত্ব আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য।

এই গুরুতর কথা, যাহা আজিও কৃতবিদ্য সভ্য মানুষ্যরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না, তাহা কি আদিম অসভ্য জাতিদিগের জানা ছিল? ইহা অসম্ভব। বিজ্ঞান* প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর জ্ঞানের উন্নতি অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমশঃ হইয়া আসিতেছে ; তখন সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ব্বোধ্য যে জ্ঞান তাহাই আদিম মনুষ্য সর্ব্বাগ্রে লাভ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। অনেকে বলিবেন, ও বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরকৃপায় তাহা অসম্ভব নহে; যাহা মনুষ্য উদ্ধারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা কৃপা করিয়া তিনি অপক্কবুদ্ধি আদিম মনুষ্যের হৃদয়ে প্রকটিত করিতে পারেন ; এবং এখনও দেখিতে পাই যে, সভ্য সমাজস্থিত অনেক অকৃতবিদ্যা মূর্খেরও ঈশ্বরজ্ঞান আছে। এ উত্তর যথার্থ নহে। কেন না, এখন পৃথিবীতে যে সকল অসভ্য জাতি বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে, যে তাহাদের মধ্যে প্রায়ই ঈশ্বরজ্ঞান নাই। একটা মনুষ্যের আদি পুরুষ কিম্বা একটা বড় ভূত বলিয়া কোন অলৌকিক চৈতন্যে কোন কোন অসভ্য জাতির বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরজ্ঞান নহে। তেমনি সভ্য সমাজস্থ নির্ব্বোধ মূর্খ ব্যক্তি ঈশ্বর নাম শুনিয়া তাহার মৌখিক ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু যাহার চিত্তবৃত্তি অনুশীলিত হয় নাই, তাহার পক্ষে ঈশ্বরজ্ঞান অসম্ভব। বহি না পড়িলে যে চিত্তবৃত্তি সকল অনুশীলিত হয় না এমন নহে। কিন্তু যে প্রকারেই হউক, বুদ্ধি, ভক্তি প্রভৃতির সম্যক্ অনুশীলন ভিন্ন ঈশ্বরজ্ঞান অসম্ভব। তাহা না থাকিলে, ঈশ্বর নামে কেবল দেবদেবীর উপাসনাই সম্ভব।

অতএব বুদ্ধির মার্জ্জিতাবস্থা ভিন্ন মনুষ্যহৃদয়ে ঈশ্বরজ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা নাই। কোন জাতি যে পরিমাণে সভ্য হইয়া মার্জ্জিতবুদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে। এ কথার প্রতিবাদে যদি কেহ প্রাচীন য়িহুদীদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে, তাহারা প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির অপেক্ষায় সভ্যতায় হীন হইয়াও ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, য়িহুদীদিগের যে ঈশ্বরজ্ঞান বস্তুতঃ ঈশ্বরজ্ঞান নহেন। জিহোবাকে আমরা আমাদের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষকদিগের কৃপায় ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু জিহোবা য়িহুদীদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা হইলেও ঈশ্বর নহেন। তিনি রাগদ্বেষপরতন্ত্র পক্ষপাতী মনুষ্যপ্রকৃত দেবতামাত্র। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত গ্রীকেরা ইহার অপেক্ষা উন্নত ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে ঈশ্বরজ্ঞান, যিশু য়িহুদী হইলেও, সে জ্ঞান কেবল য়িহুদীদিগেরই নিকট প্রাপ্ত নহে। খৃষ্টধর্ম্মের যথার্থ প্রণেতা সেণ্ট পল। তিনি গ্রীকদিগের শাস্ত্রে অত্যন্ত সুশিক্ষিত ছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা বৈদিক হিন্দুরাই অল্পকাল সভ্যতার পদবীতে আরূঢ় হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা এ পর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্মের কেবল দেবতাতত্ত্বই সমালোচনা করিয়াছি। কেন না সেইটা গোড়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিপক্ক যে বৈদিক ধর্ম্ম, তাহা অতি উন্নত ধর্ম্ম, এবং এক ঈশ্বরের উপাসনাই তাহার স্থূল মর্ম্ম। তবে বলিবার কথা এই যে, প্রথম হিন্দুরা, একেবারে গোড়া হইতে ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই। জাতিকর্ত্তৃক ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্তির সচরাচর ইতিহাস এই যে, আগে নৈসর্গিক পদার্থ বা শক্তিতে ক্রিয়মান্ চৈতন্য আরোপ করে, অচেতনে চৈতন্য আরোপ করে। তাহাতে কি প্রকারে দেবোৎপত্তি হয় তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই প্রণালী অনুসারে, বৈদিকেরা কি প্রকারে ইন্দ্রাদি দেব পাইয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়াছি। এই অবস্থায় জ্ঞানের উন্নতি হইলে উপাসকেরা দেখিতে পান যে, আকাশের উপাসনা করি, বায়ুরই উপাসনা করি, মেঘেরই উপাসনা করি, আর অগ্নিরই উপাসনা করি, এই সকল পদার্থই নিয়মের অধীন। এই নিয়মেও সর্ব্বত্র একত্ব, এক স্বভাব দেখা যায়। ঘোল মউনির তাড়নে ঘোল আর বাত্যাতাড়িত সমুদ্র এক নিয়মে বিলোড়িত হয় ; যে নিয়মে আমার হাতের গণ্ডূষের জল পড়িয়া যায়, সেই নিয়মেই আকাশের বৃষ্টি পৃথিবীতে পড়ে। এক নিয়তি সকলকে শাসন করিতেছে ; সকলই সেই

নিয়মের অধীন হইয়া আপন আপন কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, কেহই নিয়মকে ব্যতিক্ষুণ্ন করিতে পারেন না। তবে ইহাদেরও নিয়মকর্ত্তা, শাস্তা, এবং কারণস্বরূপ আর একজন আছেন। এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে সকলই সেই এক নিয়মে চালিত ; অতএব এই বিশ্বজগতের সর্ব্বাংশই সেই নিয়মকর্ত্তার প্রণীত এবং শাসিত। ইন্দ্রাদি হইতে রেণুকণা পর্য্যন্ত সকলই এক নিয়মের অধীন, সকলই এক জনের সৃষ্ট ও রক্ষিত, এবং এক জনই তাহার লয়কর্ত্তা। ইহাই সরল ঈশ্বরজ্ঞান। জড়ের উপাসনা হইতেই ইহা অনেক সময়ে উৎপন্ন হয়, কেন না, জড়ের একতা ও নিয়মাধীনতা ক্রমশঃ উপাসকের হৃদয়ঙ্গম হয়।

তবে ঈশ্বরজ্ঞান উপস্থিত হইলেই যে দেবদেবীর উপাসনা লুপ্ত হইবে এমন নহে। যাহাদিগকে চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া পূর্ব্বে বিশ্বাস হইয়াছে, জ্ঞানের আরও অধিক উন্নতি না হইলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা ব্যতীত, তাহাদিগকে জড় ও অচেতন বলিয়া বিবেচনা হয় না। ঈশ্বরজ্ঞান এই বিশ্বাসের প্রতিষেধক হয় না। ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা হউন, কিন্তু ইন্দ্রাদিও আছে, এই বিশ্বাস থাকে-তবে ঈশ্বরজ্ঞান হইলে উপাসক ইহা বিবেচনা করে যে, এই ইন্দ্রাদিও সেই ঈশ্বরের সৃষ্ট, এবং তাঁহার নিয়োগানুসারেই স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করে। ঈশ্বর যেমন মনুষ্য ও জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি ইন্দ্রাদিকেও করিয়াছেন ; এবং মনুষ্য ও জীবগণকে যেমন পালন ও কল্পে কল্পে ধ্বংস করে, ইন্দ্রাদিকেও সেইরূপ করিয়া থাকেন। তবে ইন্দ্রাদিও মনুষ্যের উপাস্য, এ কথাতে বিশ্বাস থাকে, কেন না ইন্দ্রাদিকে লোকেত্তর শক্তিসম্পন্ন ও ঈশ্বর কর্ত্তৃক লোকরক্ষায় নিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস থাকে। এই কারণে ঈশ্বরজ্ঞান জন্মিলেও, জাতি মধ্যে দেবদেবীর উপাসনা উঠিয়া যায় না। হিন্দুধর্ম্মে তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাই প্রচলিত সাধারণ হিন্দুধর্ম্ম-অর্থাৎ লৌকিক হিন্দুধর্ম্ম, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম নহে। লৌকিক হিন্দুধর্ম্ম এই যে, একজন ঈশ্বর সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বকর্ত্তা, কিন্তু দেবগণও আছেন, এবং তাঁহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া লোক রক্ষা করিতেছেন। বেদে এবং হিন্দু শাস্ত্রের অন্যান্য অংশে স্থানে স্থানে এই ভাবের বাহুল্য আছে।

তার পর, জ্ঞানের আর একটু উন্নতি হইলে, দেবদেবী সম্বন্ধে ভাবান্তরের উদয় হয়। জ্ঞানবান্ উপাসক দেখিতে পান যে, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন না, ঈশ্বরের শক্তিতে বা ঈশ্বরের নিয়মে বৃষ্টি হয় ; ঈশ্বরই বৃষ্টি করেন। বায়ু নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা বাতাস করেন না ;

বাতাস ঐশিক কার্য্য। সূর্য্য চৈতন্যবিশিষ্ট আলোককর্ত্তা নহেন ; সূর্য্য জড় বস্তু, সৌরালোকও ঐশিক ক্রিয়া। যখন বৃষ্টিকর্ত্তা, বায়ুকর্ত্তা আলোকদাতা প্রভৃতি সকলেই সেই ঈশ্বর বলিয়া জানা গেল, তখন ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য্য, এ সকল উপাসনাকালে ঈশ্বরেরই নামান্তর বলিয়া গৃহীত হইল। তিনি এক, কিন্তু তাঁহার বিকাশ ও ক্রিয়া অসংখ্য, কার্য্যভেদে, শক্তিভেদে, বিকাশভেদে তাঁহার নামও অসংখ্য। তখন, উপাসক যখন ইন্দ্র বলিয়া ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে, যখন বরুণ বলিয়া ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে; তখন সূর্য্যকে বা অগ্নিকে ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে।

ইহার এক ফল হয় এই যে, উপাসক ঈশ্বরের স্তবকালে ঈশ্বরকে পূর্ব্বপরিচিত ইন্দ্রাদি নামে অভিহিত করে। ঈশ্বরই ইন্দ্রাদি, কাজেই ইন্দ্রাদিও ঈশ্বরের নামান্তর। তখন ইন্দ্রাদি নামে তাঁহার পূজাকালীন, ইন্দ্রাদির প্রতি সর্ব্বাঙ্গীণ জগদীশ্বরত্ব আরোপিত হয়। কেন না, জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহই ইন্দ্রাদি নাই।

বেদের সূক্তে এই ভাবের বিশেষ বাহুল্য দেখিতে পাই। এ সূক্তে ইন্দ্রে জগদীশ্বরত্ব, ও সূক্তে বরুণে জগদীশ্বরত্ব, অন্য সূক্তে অগ্নিতে জগদীশ্বরত্ব, সূক্তান্তরে সূর্য্যে জগদীশ্বরত্ব, এইরূপ পুনঃ পুনঃ আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মাক্ষমূলর ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার ভাবিয়া কি বলিয়া এরূপ ধর্ম্মের নামকরণ করিবেন, তদ্বিষয়িণী দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মাণ! এরূপ কাণ্ডটা ত কোন পাশ্চাত্ত্য ধর্ম্মে নাই, ইহা না Theism না Polytheism, না Atheism কেন ismই নয়! ভাবিয়া চিন্তিয়া পণ্ডিতপ্রবর গ্রীক ভাষার অভিধান খুলিয়া খুব দেড়গজী রকম একটা নাম প্রস্তুত করিলেন- Kakenotheism বা Henotheism এই সকল বিদ্যা যে এ দেশে অধীত, অধ্যাপিত, আদৃত, এবং অনুবাদিত হয়, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। আচার্য্য মাক্ষমূলর বেদ বিশেষ প্রকারে অধীত করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণেতিহাসে তাঁহার কিছুই দর্শন নাই বলিলেও হয়। যদি থাকিত, তাহা হইলে জানিতেন যে, এই দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার-অর্থাৎ সকল দেবতাতেই জগদীশ্বরত্ব আরোপ, কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। উহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে-কেবল সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপারে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দর্শন। তাঁহার Henotheism

বা Kakenotheism আর কিছুই নহে, কেবল Polytheism নাম সামগ্রীর উত্তরাধিকারী Pure Theism.

এই গেল বৈদিক ধর্ম্মের তিন অবস্থা-

(১) প্রথম, দেবোপাসনা-অর্থাৎ জড়ে চৈতন্য আরোপ, এবং তাহার উপাসনা।

(২) ঈশ্বরোপাসনা, এবং তৎসঙ্গে দেবোপাসনা।

(৩) ঈশ্বরোপাসনা, এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয়।

বৈদিক ধর্ম্মের চরমাবস্থা উপনিষদে। সেখানে দেবগণ একেবারে দূরীকৃত বলিলেই হয়। কেবল আনন্দময় ব্রহ্মই উপাস্যস্বরূপ বিরাজমান। এই ধর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ। ইহা চতুর্থাবস্থা।

শেষে গীতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আবির্ভাবে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি মিলিতা হইল। তখন হিন্দুধর্ম্ম হইল। ইহাই সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মের মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান, এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম। ইহাই সকল মনুষ্যের অবলম্বনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে হিন্দুরা এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশক বা দেশাচারকে হিন্দুধর্ম্মের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের অবনতি এবং হিন্দুজাতির অবনতি ঘটিয়াছে।

এক্ষণে যাহা বলিলাম তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। সফল হইব কিনা, তাহা যিনি এই ধর্ম্মের উপাস্য, তাঁহারই হাত। কিন্তু পাঠকের যেন এই কয়টা স্থূল কথা মনে থাকে। নহিলে পরিশ্রম বৃথা হইবে। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ পায়, তাহা ধারাবাহিক ক্রমে না পড়িয়া, মাঝে মাঝে পড়িলে সে সকলের মর্ম্ম গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। হস্তীই হউক, আর শৃগালই হউক, অন্ধের ন্যায় কেবল তাহার কর চরণ বা কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহার স্বরূপ অনুভব করা যায় না। "এটা রাজদ্বারে আছে, সুতরাং বান্ধব", এ রকম কথা আমরা শুনিয়াছি।-'প্রচার', ২য় বর্ষ, পৃ. ৭৪-৮০।

———————

* হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহা অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে, “বিজ্ঞান” অর্থে Science নহে। কিন্তু এক্ষণে ঐ অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া আমিও ঐ অর্থে ব্যবহার করিতে বাধ্য। “নীতি” শব্দের ঐরূপ দশা ঘটিয়াছে। নীতি অর্থে Politics কিন্তু এখন আমরা “Morals” অর্থে ব্যবহার করি।

বেদের ঈশ্বরবাদ

প্রবাদ আছে হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটি দেবতা, কিন্তু বেদে বলে মোটে তেত্রিশটি দেবতা। এ সম্বন্ধে আমরা প্রথম প্রবন্ধে যে সকল ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আমরা দেখিয়াছি, বেদে বলে এই তেত্রিশটি দেবতা তিন শ্রেণীভুক্ত ; এগারটি আকাশে, এগারটি অন্তরিক্ষে, এগারটি পৃথিবীতে।

ইহাতে যাস্ক কি বলেন শুনা যাউক। তিনি অতি প্রাচীন নিরুক্তকার-আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত নহেন। তিনি বলেন,

"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বা ইন্দ্র বা অন্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাদ্ একৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্ত। অপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ যথা হোতা অধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যস্যেকস্য সতঃ।" ৭। ৫।

অর্থাৎ "নৈরুক্তদিগের মতে বেদের দেবতা তিন জন। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য্য। তাঁহাদের মহাভাগত্ব কারণ এক এক জনের অনেকগুলি নাম। অথবা তাঁহাদিগের কর্ম্মের পার্থক্য জন্য, যথা হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, এক জনেরই নাম হয়।

তেত্রিশ কোটির স্থানে গোড়ায় তেত্রিশ পাইয়াছিলাম, এখন নিরুক্তের মতে, তেত্রিশের স্থানে মোটে তিন জন দেখিতেছি-অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র, এবং সূর্য্য। বহুসংখ্যক পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য দ্বারা যে জগৎ শাসিত হয় না-জাগতিকী শক্তি এক, বহুবিধা নহে, পৃথিবীতে সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন, অন্তরিক্ষে সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন, এবং আকাশে সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন এখন তাঁহারা দেখিতেছেন। পৃথিবীতে আর এগারটি পৃথক্ দেবতা নাই-এক দেবতা, তাঁহার কর্ম্মভেদে অনেক নাম, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি এক, অনেক দেবতা নহেন। তেমনি অন্তরিক্ষেও এক দেবতা, আকাশেও এক দেবতা।

এখনও প্রকাশ পাইতেছে না যে, ঋষিরা জাগতিক শক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য অনুভূত করিয়াছেন। এখন পৃথিবীর এক দেবতা, অন্তরিক্ষের অন্য দেবতা, আকাশের তৃতীয়

দেবতা। জীব, উদ্ভিদাদির উৎপত্তি ও রক্ষা হইতে বায়ু বৃষ্টি প্রভৃতি অন্তরিক্ষের ক্রিয়া এত ভিন্নপ্রকৃতি, আবার সে সকল হইতে আলোকাদি আকাশব্যাপার সকল এত ভিন্ন যে, এই তিনের ঐক্য এবং একনিয়মাধীনত্ব অনুভূত করা আরও কালসাপেক্ষ। কিন্তু অসীম প্রতিভাসম্পন্ন বৈদিক ঋষিদিগের নিকট তাহাও অধিক দিন অস্পষ্ট থাকে নাই। ঋগ্বেদসংহিতাতেই পাওয়া যায়, "মূৰ্দ্ধা ভূবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।" (১০-৮৮) "অগ্নি রাত্রে পৃথিবীর মস্তকব ; প্রাতে তিনি সূর্য্য হইয়া উদয় হন।" পুনশ্চ "যদেনমদধুর্য্যজ্ঞিয়াসে দিবি দেবাঃ সূর্য্যমাদিতেয়ম্।" ইহাতে "এনং অগ্নিং সূর্য্যং আদিতেয়ং" ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিই সূর্য্য বুঝাইতেছে।র্দ্ধা

এই সূক্তের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলেন, "ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ" অর্থাৎ শাকপূণি (পূর্ব্বগামী নিরুক্তকার) বলিয়াছেন যে, "পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে, এবং আকাশে তিন স্থানে অগ্নি আছেন।" ভৌম, অন্তরিক্ষ, ও দিব্য, এই ত্রিবিধ দেবই তবে অগ্নি।

অগ্নি সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক কথা পাওয়া যায়। ক্রমে জগতের একশক্ত্যধীনত্ব ঋষিদিগের মনে আরও স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যং স সুপর্ণো গুরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানং।" ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি বল, বা দিব্য সম্পূর্ণ গুরুত্মান্ বল, এক জনকেই বিপ্তগণে অনেক বলেন, যথা, "অগ্নি যম মাতরিশ্বন্।" পুনশ্চ, অথর্ব্ব বেদে, "স বরুণঃ সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যন্। স সবিতা ভূত্বা অন্তরিক্ষেণ যাতি, স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবং" সেই অগ্নিই সায়ংকালে বরুণ হয়েন। তিনিই প্রাতঃকালে উদয় হইয়া মিত্র হয়েন। তিনিই সবিতা হইয়া অন্তরিক্ষে গমন করেন, এবং ইন্দ্র হইয়া মধ্যাকাশে তাপ বিকাশ করেন।

এইরূপে ঋষিরা বুঝিতে লাগিলেন যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীর দেবগণ, অন্তরিক্ষের দেবগণ, এবং আকাশের দেবগণ, সব এক। অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা পৃথিবী শাসিত হয়, যে শক্তির দ্বারা অন্তরিক্ষের প্রক্রিয়া সকল শাসিত হয়, যে শক্তির দ্বারা আকাশের প্রক্রিয়া সকল শাসিত হয়, সবই এক। জগৎ একই নিয়মের অধীন। একই নিয়ন্তার অধীন। "মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্" (ঋগ্বেদসংহিতা ৩।৫৫) এইরূপে বেদে

একেশ্বরবাদ উপস্থিত হইল। অতএব বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম তেত্রিশ দেবতারও উপাসনা নহে, তিনি দেবতারও উপাসনা নহে, এক ঈশ্বরের উপাসনাই বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম। বেদে যে ইন্দ্রাদির উপাসনা আছে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। স্থূলতঃ উহা জড়ের উপাসনা। সেইটি বেদের প্রাচীন এবং অসংস্কৃতাবস্থা। সূক্ষ্মতঃ উহা ঈশ্বরের বিবিধ শক্তি এবং বিকাশের উপাসনা-ঈশ্বরেরই উপাসনা। ইহাই বৈদিক ধর্ম্মের পরিণাম এবং সংস্কৃতাবস্থা। সাধারণ হিন্দু যদি জানিত যে, বেদে কি আছে, তাহা হইলে কখন আজিকার হিন্দুধর্ম্ম এমন কুসংস্কারাপন্ন এবং অবনত হইত না ; মনসা মাকালের পূজায় পৌঁছিত না। জ্ঞান, চাবি-তালার ভিতর বদ্ধ থাকাই উন্নতিপ্রাপ্ত সমাজের অবনতির কারণ। ভারতবর্ষে সচরাচর জ্ঞান চাবি-তালার ভিতর বদ্ধ থাকে ; যাঁহার হাতে চাবি তিনি কদাচ কখন সিন্ধুক খুলিয়া, এক-আধ টুকরা কোন প্রিয় শিষ্যকে বকশিষ করেন। তাই, ভারতবর্ষ অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার হইলেও সাধারণ ভারতসন্তান অজ্ঞান। ইউরোপের পুঁজি পাটা অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু ইউরোপীয়েরা জ্ঞান বিতরণে সম্পূর্ণ মুক্তহস্ত। এই জন্য ইউরোপের ক্রমশঃ উন্নতি, আর এই জন্য ভারতবর্ষের ক্রমশঃ অবনতি। বেদ এত দিন চাবি-তালার ভিতর ছিল, তাই বেদমূলক ধর্ম্মের ক্রমশঃ অবনতি। সৌভাগ্যক্রমে, বেদ এখন সাধারণ বাঙ্গালির বোধগম্য হইতে চলিল। বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ সকল প্রচার হইতেছে। বাবু মহেশচন্দ্র পাল উপনিষদ্ ভাগের সানুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা প্রভৃতির অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত সংহিতার অনুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। এই তিন জনেই ধন্যবাদের পাত্র।1

এইরূপে বৈদিক ঋষিরা ক্রমে ক্রমে এক বেদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জানিলেন যে এক জনই সব করিয়াছেন ও সব করেন। যাস্ক বলেন-"মাহাত্ম্যাদ্দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে। একস্যাত্মনোহন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।"

মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত এক আত্মা বহু দেবতা স্বরূপ স্তুত হন। দেবতা সকলেই একই আত্মার প্রত্যঙ্গমাত্র। অতএব ঈশ্বর এক ইহা স্থির।

(১) তিনি একাই এই বিশ্ব নির্ম্মিত করিয়াছেন, এই জন্য বেদে তাঁহার নাম বিশ্বকর্ম্মা। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সূক্তে জগৎকর্ত্তার এই নাম-পুরাণেতিহাসে বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদের প্রধান শিল্পকর মাত্র। সূক্তে আছে যে, তিনি আকাশ ও পৃথিবী নির্ম্মান করিয়াছেন (১০। ৮১। ২) বিশ্বময় (বিশ্বতঃ) তাঁহার চক্ষু, মুখ, বাহু, পদ (ঐ, ৩) ইত্যাদি।

(২) তিনি হিরণ্যগর্ভ। এই হিরণ্যগর্ভের নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার ব্যাখ্যা আছে। হেমতুল্য নারায়ণসৃষ্ট অণ্ড হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্মাকে মনুসংহিতায় হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে এবং পুরাণেতিহাসেও হিরণ্যগর্ভ শব্দের ঐরূপ ব্যাখ্যা আছে। ঐ দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বাগ্রে জাত, সর্ব্বভূতের একমাত্র পতি, স্বর্গ মর্ত্ত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, আত্মদ, বলদ, বিশ্বের উপাসিত, জগতের একমাত্র রাজা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৩) তিনি প্রজাপতি। তাঁহা হইতে সকল প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে। স্থানে স্থানে সূর্য্য বা সবিতাকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। কিন্তু পরিশেষে যাঁহাকে ঋষিরা জগতের একমাত্র চৈতন্যবিশিষ্ট সর্ব্বস্রষ্টা বলিয়া বুঝিলেন তখন তাঁহাকেই এই নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক দিনে ব্রহ্মাই এই নাম প্রাপ্ত হইলেন। ঋগ্বেদসংহিতায় ব্রহ্মা শব্দ নাই।

(৪) ব্রহ্ম শব্দও আমি ঋগ্বেদসংহিতায় কোথাও দেখিতে পাই নাই। অথচ বেদের যে পরভাগ, উপনিষদ্, এই ব্রহ্ম নিরূপণ তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ ভাগে ও বাজসনেয়সংহিতায় ও অথর্ব্বেদে ব্রহ্মকে দেখা যায়। সে সকল কথা পরে হইবে।

(৫) ঋগ্বেদসংহিতার ৯০ সূক্তকে পুরুষসূক্ত বলে। ইহাতে সর্ব্বব্যাপী পুরুষের বর্ণনা আছে। এই পুরুষ শতপথব্রাহ্মণে নারায়ণ নামে কথিত হইয়াছে। অদ্যাপি বিষ্ণুপূজায় পুরুষসূক্তের প্রথম ঋক্ ব্যবহৃত হয়-

সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং

কথিত হইয়াছে যে, এই পুরুষকে দেবতারা হবির সঙ্গে যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞফলে সমস্ত জীবের উৎপত্তি। এই পুরুষ "সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং"-সমস্ত বিশ্ব

ইহার এক পাদ মাত্র। বিশ্বকর্ম্মা হিরণ্যগর্ভ ও প্রজাপতির সঙ্গে, এই পুরুষ একীভূত হইলে বৈদান্তিক পরব্রহ্মে প্রায় উপস্থিত হওয়া যায়।

অতএব অতি প্রাচীন কালেই বৈদিকেরা জড়োপাসনা হইতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিছু দিন সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাদি বহু দেবের উপাসনা রহিল। ক্রমে ক্রমে দেখিব যে, সেই ইন্দ্রাদিও পরমাত্মায় লীন হইলেন। দেখিব যে, হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম একমাত্র জগদীশ্বরের উপাসনা। আর সকলই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র।

যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং ‖ গীতা ৯। ২৩।

আমরা ঋগ্বেদ হইতেই আরম্ভ করি, আর রামপ্রসাদের শ্যামা বিষয়[2] হইতেই আরম্ভ করি, সেই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মেই উপস্থিত হইতে হইবে। বুঝিব-এক ঈশ্বর আছেন, অন্য কোন দেবতা নাই। ইন্দ্রাদি নামেই ডাকি, সেই এক জনকেই ডাকি। ইহাই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম।- ‘প্রচার’, ২য় বর্ষ, পৃ. ১৪৭-৫২।

----

1 এস্থলে বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ অতি গুরুতর ব্যাপার। রমেশ বাবু যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা, বিশুদ্ধি, এবং সর্ব্বাঙ্গীণতার অনুবাদ অতি এই কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতেছেন, ইউরোপে হইলে এত দিন বড় জয় জয়কার পড়িয়া যাইত। আমাদের সমাজে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, ভরসা করি, তিনি ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, এবং প্রথম অষ্টকের অনুবাদ দেখিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহার ভূয়ো ভূয়ো প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য। পাঠকেরা বোধ করি জানেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক স্থানে সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, রমেশ বাবু সর্ব্বত্রই সায়নের অনুগামী হইয়াছেন।

বেদ সম্বন্ধে কতকগুলি বিলাতী মত আছে। অনেক স্থানে মতগুলি অশ্রদ্ধেয়, অনেক স্থলে তাহা অতি শ্রদ্ধেয়। শ্রদ্ধেয় হউক অশ্রদ্ধেয় হউক, হিন্দুর সেগুলি জানা আবশ্যক।

জানিলে বৈদিক তত্ত্ব সমুদায়ের তাঁহারা সুমীমাংসা করিতে পারেন। আমার যাহা মত, তাহার প্রতিবাদীরা কেন তাহার প্রতিবাদ করে, তাহা না জানিলে আমার মতের সত্যাসত্য কখনই আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না। অতএব সেই সকল মত সঙ্কলন করিয়া টীকাতে উহা সন্নিবেশিত করাতে রমেশ বাবুর অনুবাদ বিশেষ উপকারক হইয়াছে। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, রমেশ বাবু ৩০০ পৃষ্ঠা পুস্তকের ‖ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, বোধ করি ইহা কেবল ছাপার খরচেই বিক্রীত হইতেছে।

যিনি যাহাই বলুন, রমেশচন্দ্রের এই কীর্ত্তিটি চিরস্মরণীয় হইবে। ইউরোপে যখন বাইবেল প্রথম ইংরেজি প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হয়, তখন রোমকীয় পুরোহিত এবং অধ্যাপক সম্প্রদায়, অনুবাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। রমেশ বাবুর প্রতিও সেইরূপ অত্যাচার হওয়াই সম্ভবে। কিন্তু যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে, ইউরোপ উপধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশ বাবুর এই অনুবাদে এ দেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে। বাঙ্গালী ইঁহার ঋণ কখন প্রতিশোধ করিতে পারিবে না।

প্রথম অষ্টকের অনুবাদ এক খণ্ড আমাদিগের নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। ‘প্রচারে কোন গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এবং বর্ত্তমান লেখকও গ্রন্থসমালোচনার কার্য্যে হস্তক্ষেপকরণে পরাঙ্মুখ। এজন্য ‘প্রচারে’ উহার সমালোচনার সম্ভাবনা নাই। তবে, যে উদ্দেশ্যে ‘প্রচারে’ এই বৈদিক প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে, এই অনুবাদ সেই উদ্দেশ্যের সহায় ও সাধক। এই জন্য এই অনুবাদ সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলা প্রয়োজন বিবেচনা করিলাম। বেদে কি আছে তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বেদের অনুবাদ পাঠ করিতে হইবে-আমরা বেশী উদাহরণ উদ্ধৃত করি- ‘প্রচারে’ এত স্থান নাই।

2 রামপ্রসাদ কালী নামে পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন।
প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি।

হিন্দুধর্ম্মের ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই

প্রথমে জড়োপাসনা। তখন জড়কেই চৈতন্যবিশিষ্ট বিবেচনা হয়, জড় হইতে জাগতিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে বোধ হয়। তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায়, জাগতিক ব্যাপার সকল নিয়মাধীন। এক জন সর্ব্বনিয়ন্তা তখন পাওয়া যায়। ইহাই ঈশ্বরজ্ঞান। কিন্তু যে সকল জড়কে চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া লোকে উপাসনা করিত, ঈশ্বরজ্ঞান হইলেই তাহাদের উপাসনা লোপ পায় না। তাহারা সেই সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট চৈতন্য এবং বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত বলিয়া উপাসিত হইতে থাকে।

তবে দেবগণ ঈশ্বরসৃষ্ট, এ কথা ঋগ্বেদের সূক্তের ভিতর পাইবার তেমন সম্ভাবনা নাই। কেন না, সূক্ত সকল ঐ সকল দেবগণেরই স্তোত্র ; স্তোত্রে স্তুতকে কেহ ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিতে চাহে না। কিন্তু ঐ ভাব উপনিষদ্ সকলে অত্যন্ত পরিস্ফুট। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদের আরম্ভেই আছে,

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র আত্মাই ছিলেন-আর কিছুমাত্র ছিল না। পরে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন ;

স ঈক্ষতে মে নু লোকা লোকাপাল্লানু সৃজা ইতি। ইত্যাদি।

আমরা বলিয়াছি যে, পরিশেষে যখন জ্ঞানের আধিক্যে লোকের আর জড় চৈতন্য বিশ্বাস থাকে না, তখন উপাসক ঐ সকল জড়কে ঈশ্বরের শক্তি বা বিকাশ মাত্র বিবেচনা করে। তখন ঈশ্বর হইতে ইন্দ্রাদির ভেদ থাকে না, ইন্দ্রাদি নাম, ঈশ্বরের নামে পরিণত হয়। ইহাই আচার্য্য মাক্ষমূলরের Henotheism. ঋগ্বেদ হইতে তিনি ইহার বিস্তর উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং যিনি এই কথার বৈদিক প্রমাণ চাহেন, তাঁহাকে উক্ত লেখকের গ্রন্থাবলীর উপর বরাত দিলাম। এখানে সে সকল প্রমাণের পুনঃ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই; যে কথাটা আচার্য্য মহাশয় বুঝেন নাই, তাহা এই। তিনি বলেন, এটি বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ যে, যখন যে দেবতার স্তুতি করা হয়, তখন সেই দেবতাকে সকলের উপর

বাড়ান হয়। স্থূল কথা যে,উহা বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ নহে-পুরানেতিহাসে সর্ব্বত্র আছে- উহা পরিণত হিন্দুধর্ম্মের একেশ্বরবাদের সঙ্গে প্রাচীন বহু দেবোপাসনার সংমিলন। যখন দেবতা একমাত্র বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, তখন ইন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি নামগুলি তাঁহারই নাম হইল। এবং তিনিই ইন্দ্রাদি নামে স্তুত হইতে লাগিলেন।

এই ইন্দ্রাদি যে শেষে সকলই ঈশ্বর স্বরূপ উপাসিত হইতেন, তাহার প্রমাণ বেদ হইতে দিলাম না। আচার্য্য মাক্ষমূলরের গ্রন্থে সকল উদ্ধৃত Henotheism সম্বন্ধীয় উদাহরণগুলিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। আমি দেখাইব যে ইহা কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। তজ্জন্য মহাভারত হইতে কয়েকটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

ইন্দ্র স্তোত্র আদিপর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। “হে সুরপতে! সম্প্রতি তোমা ব্যতিরেকে আমাদিগের প্রমাণ রক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই-যেহেতু তুমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করিতে সমর্থ। তুমি বায়ু ; তুমি মেঘ ; তুমি অগ্নি ; তুমি গগনমণ্ডলে সৌদামিনী রূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে ; তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করে ; তুমি ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিঃস্বরূপ ; তুমি আদিত্য ; তুমি বিভাবসু ; তুমি অত্যাশ্চর্য্য মহাভূত ; তুমি নিখিল দেবগণের অধিপতি ; তুমি সহস্রাক্ষ ; তুমি দেব ; তুমি পরমগতি ; তুমি অক্ষয় অমৃত ; তুমি পরম পূজিত সৌম্যমূর্ত্তি ; তুমি মুহূর্ত্ত ; তুমি তিথি ; তুমি বল ; তুমি ক্ষণ ; তুমি শুক্লপক্ষ ; তুমি কৃষ্ণপক্ষ ; তুমিই কলা, কাষ্ঠা, ত্রুটী, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ও অহোরাত্র ; তুমি সমস্ত পর্ব্বত ও বনসমাকীর্ণ বসুন্ধরা ; তুমি তিমিরবিরহিত ও সূর্য্যসংস্কৃত আকাশ ; তুমি তিমিতিমিঙ্গিল সহিত উত্তুঙ্গতরঙ্গকুলসঙ্কুল মহার্ণব।” এই স্তোত্রে জগদ্ব্যাপী পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইল।

তার পর আদিপর্ব্বের দুই শত ঊনবিংশ অধ্যায় হইতে অগ্নি স্তোত্র উদ্ধৃত করি।

“হে হুতাশন! মহর্ষিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ক্ষণকালমধ্যে ধ্বংস হইয়া যায় ; বিপ্রগণ স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্ম্মবিজিত ইষ্টগতিপ্রাপ্ত হন। হে অগ্নে! সজ্জনগণ তোমাকে আকাশবিলগ্ন সবিদ্যুৎ জলধর বলিয়া থাকেন ; তোমা হইতে অস্ত্র সমুদায় নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে

দগ্ধ করে ; হে জাতবেদঃ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নির্ম্মাণ করিয়াছ ; তুমিই সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন করিয়াছ ; তোমাতেই হব্য ও কব্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে ; হে দেব! তুমি দহন ; তুমি ধাতা ; তুমি বৃহস্পতি ; তুমি অশ্বিনীকুমার ; তুমি মিত্র ; তুমি সোম এবং তুমিই পবন।"

বনপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে সূর্য্য স্তোত্র এইরূপ-"ওঁ সূর্য্য ; অর্য্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান্, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতব, প্রভাকর, পৃথিবী, জল তেজঃ, আকাশ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, সৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্যুতাগ্নি, জঠরাগ্নি, ঐন্ধনাগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সম্বৎসরকর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, ব্যাক্তাব্যক্ত, পুরুষ, শাশ্বতযোগী, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, স্রষ্টা, সম্বর্ত্তক, বহ্নি, সর্ব্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, জয়, বিশাল, বরদ, মন সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, দিতিসূত, দ্বাদশাক্ষর, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, তৃবিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা ও মৈত্রেয়, স্বয়ম্ভূ ও অমিততেজা।"

তার পর আদিপর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছিঃ-

"হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে ; তোমরাই সর্ব্বভূতপ্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমারই সংসারে প্রপঞ্চস্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ। দেশকাল ও অবস্থাদ্বারা তোমাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না ; তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে দ্যোতমান আছ ; তোমরা শরীরবৃক্ষে পক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ ; তোমরা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার পরমাণু সমষ্টি ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা রাখ না ; তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর ; তোমরাই স্বীয়প্রকৃতি বিক্ষেপশক্তি দ্বারা নিখিলবিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ।"

দুই শত একত্রিশ অধ্যায়ে, কার্ত্তিকেয়ের স্তোত্র এইরূপঃ-

"তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পবিত্র ; মন্ত্র সকল তোমারই স্তব করিয়া থাকে ; তুমিই বিখ্যাত হুতাশন, তুমিই সংবৎসর, তুমিই ছয় ঋতু, মাস, অর্দ্ধ মাস, অয়ন ও দিক্। হে রাজীবলোচন! তুমি সহস্রমুখ ও সহস্রবাহু ; তুমি লোক সকলের পাতা, তুমি পরমপবিত্র হবি, তুমিই সুরাসুরগণের শুদ্ধিকর্ত্তা ; তুমিই প্রচণ্ড প্রভু ও শত্রুগণের জেতা ; তুমি সহস্রভূ ; তুমি সহস্রভূজ ও সহস্রশীর্ষ ; তুমি অনন্তরূপ, তুমি সহস্রপাৎ, তুমিই গুরুশক্তিধারী।"

তার পর আদিপর্ব্বে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের গরুড় স্তোত্রে-

"হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি সুখ, তুমি দুঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহৎযশঃ, তুমি প্রভা, তুমি আমাদিগের পবিত্র স্থান, তুমি বল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিমান, তুমি অন্তক, তুমি স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমি অতি দুঃসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচর স্বরূপ, হে প্রভূতকীর্ত্তি গরুড়! ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে সূর্য্যের তেজোরাশি সমাক্ষিপ্ত করিতেছ, হে হুতাশনপ্রভ! তুমি কোপাবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজা সকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি সর্ব্বসংহারে উদ্যত যুগান্ত বায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছ। আমরা মহাবলপরাক্রান্ত বিদ্যুৎসমানকান্তি, গগনবিহারী, অমিতপরাক্রমশালী, খগকুলচূড়ামণি, গরুড়ের শরণ লইলাম।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব সম্বন্ধে এইরূপ স্তোত্রের এতই বাহুল্য পুরাণাদিতে আছে যে, তাহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন হইতেছে না, এক্ষণে আমরা সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ করি-

যেহপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যাবিধিপূর্ব্বকং || গীতা। ৯। ২৩।

অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্ব্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।-'প্রচার', ২য় বর্ষ, পৃ. ২৭৪- ৭৮।